হঠাৎ বসন্ত

প্রফুল্ল রায়

হঠাৎ বসন্ত

প্রফুল্ল রায়

DLOBL এর নিবেদন

DLOBL এর সম্মানিত পাঠকদের অনুরোধ করছি যে dlobl.org তে প্রকাশিত যে কোন বই অন্যত্র শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। বিভিন্ন ওয়েবসাইট কিংবা সামাজিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি ফাইল শেয়ার না করে dlobl সাইটের লিঙ্ক শেয়ার করুন। যাতে করে যেন আরও অনেক অনেক বই পড়ুয়া মানুষগুলো আমাদের কমিউনিটিতে যুক্ত হতে পারে।

আপনাদের সহযোগীতাই আমাদের বল। আপনরা যদি আমাদের প্রজেক্টকে সাপোর্ট করেন তবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব। নয়তো আমরাও হারিয়ে যাব কিংবা কিছু বিশেষ কিছু মানুষের মধ্যে প্রচেক্টটি সীমাবদ্ধ রেখে এগিয়ে যাব।

মনে রাখবেন, একটি ইবই তৈরীতে যে পরিশ্রম এবং সময় ব্যয় হয় তা যেন বৃথা না যায় কিংবা আমরা যেন উৎসাহ না হারিয়ে ফেলি তা টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব অইক্ষর অইপন অইস অইসন অইসা অঈদ অউপকারী অঋণী অ-এছলামী অএলা অএলাহু, অএলাহু অএলিহু, অএলিহুঁ অও অওকা অওকে অংকুশ অংগরাখা অংরাখা অংশ অংশ-অবতার অংশগ্রহণ অংশগ্রহণকারী

বম্বে হারবার লাইনের লাস্ট ডাউন ট্রেনটা ভিক্টোরিয়া টারমিনাস থেকে যখন বান্দ্রা পৌঁছুল, প্ল্যাটফর্মের প্রকাণ্ড ঘড়িটায় তখন রাত একটা বেজে পঁচিশ। বান্দ্রা এ-লাইনের শেষ স্টেশন। বোম্বাইয়ের যে শহরতলি দিয়ে হারবার লাইনের ট্রেনগুলো যায়, তার দু-ধারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট অর্থাৎ কটন মিল, গ্লাস ফ্যাক্টরি, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আছে বম্বে পোর্ট। সারাদিন, শুধু দিনই বা কেন, রাত বারোটা পর্যন্ত এ-লাইনের ট্রেনগুলোতে গাদাগাদি ভিড় লেগে থাকে। কিন্তু এখন এই লাস্ট ডাউন ট্রেনটা একরকম ফাঁকাই এসেছে। বম্বে পোর্টের কিছু মজুর, কলকারখানার লাস্ট শিফটের কিছু ওয়ার্কার কামরাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। ট্রেন থামতেই তারা হুড়মুড় করে প্ল্যাটফর্মে নেমে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

জোহনের কিন্তু অত তাড়াহুড়ো নেই। ট্রেনটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেলে ধীরে-সুস্থে কাঁধে লম্বা ফ্লুটের বাক্সটা চাপিয়ে নেমে পড়ল সে। এটা সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনের বাইরে যেতে হলে লম্বা ওভারব্রিজ পেরিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে নামতে হবে। বাইরে বেরুবার গেটটা ওখানেই। জোহান এলোমেলো পা ফেলে ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। অল্প-অল্প টলছিল সে। এই টলটলায়মান অবস্থাটা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল।

জোহনের বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। জাতে সে গোয়াঞ্চি পিদ্রু, অর্থাৎ গোয়ার ক্রিশচান। গোল ধরনের মুখ তার, ধারালো চিবুক, ছড়ানো কাঁধ। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চির বেশি হবে না। গায়ের রং পোড়া ব্রোঞ্জের মতো। হাত-পায়ের হাড় বেশ চওড়া এবং মজবুত। শরীরে চর্বির পরিমাণ কম, তাই তাকে কিছুটা রোগা দেখায়। জুলপি এবং মাথার চুল সিকি ভাগ সাদা হয়ে গেছে। সব চাইতে আশ্চর্য তার চোখ। এমন সরল, মায়াবী চোখ কাচিৎ দেখা যায়।

জোহান একটা ব্যান্ড পার্টিতে লম্বা ফ্লুট অর্থাৎ বাঁশি বাজায়। এছাড়া অফ-সিজনে অর্থাৎ যখন উৎসবটুৎসব থাকে না কিংবা যেটা বিয়ের মরশুম নয়, বায়নার অভাবে তাদের বাজনার দল যখন বেকার বসে থাকে, সেই সময়টা সাট্টা কিংবা মাট্‌কা খেলে, রেসের বই-টই বেচে কিছু কমিয়ে নেয়।

এই মুহূর্তে জোহনের পরনে সার্টিনের ওপর জরির কারুকার্য-করা হাইনেক পাঞ্জাবি আর দু-ধারে লম্বালম্বি নীল বর্ডার দেওয়া ফুল প্যান্ট; মাথায় নেটিভ স্টেটের রাজাদের মতো পাগড়ি। পায়ে সস্তা দামের রঙচঙে নাগরা। অর্থাৎ ব্যান্ড পার্টির পুরো ড্রেসটা রয়েছে তার গায়ে।

আজ দুপুরে জোহনদের বাজনার দল—'আনারকলি ব্যান্ড পার্টি' মেরিন লাইন্সে এক মাড়োয়ারি শেঠের মেয়ের বিয়েতে বাজাতে গিয়েছিল। তারপর আর বাজনার ড্রেসটা ছাড়া হয়নি। শেঠজির বাড়িতে রাত এগারোটা পর্যন্ত তারা একটানা বাজিয়ে গেছে। তারপর হিসেবপত্র বুঝে নিয়ে চলে এসেছিল।

জোহনদের বাজনার দলের বেশির ভাগ লোকই থাকে পুরোনো বোম্বাইতে, পায়াধুনির দিকটায়। কেউ-কেউ তারদেও কিংবা সেন্ট্রালের কাছে। একমাত্র জোহনই এতদূরে, শহরতলির প্রায় শেষ মাথায় ছিটকে চলে এসেছে। সে ঠিক বান্দ্রাতেই থাকে না, থাকে সমুদ্রের ধারে ডান্ডা কোস্টের কাছে এক লকঝড় বস্তিতে। এখানে এই বস্তিগুলোকে বলে ঝোপড়াপট্টি। বান্দ্রা স্টেশন থেকে প্রায় তিনটি মাইল গেলে তবে ডান্ডা কোস্টের সেই ঝোপড়পট্টি।

রাত এগোরোটায় শেঠজির বাড়ি থেকে বেরিয়ে একে-একে সব যে-যার আস্তানায় চলে গেছে। একা জোহনই মেরিন লাইন্স থেকে কারনাক রোডে এসে হাঁটতে-হাঁটতে ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে চলে এসেছিল।

বিয়ে বাড়ি কিংবা ফেস্টিভ্যালে বাজাতে-টাজাতে গেলে বেশির ভাগ জায়গাতেই তাদের খাইয়ে দেয়। কিন্তু মেরিন লাইন্সের শেঠজিটি এমনই চিপপুস মাড়োয়ারি যে এক গেলাস জল পর্যন্ত খাওয়ায়নি। দুপুর একটা থেকে রাত এগারোটা অর্থাৎ ঝাড়া দশটি ঘণ্টা

একনাগাড়ে বাজিয়ে দারুণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল জোহনের। পাকস্থলীতে খিদেটা আগুনের মতো দপদপ করছিল। ক্রফোর্ড মার্কেটের পিছন দিকে সিন্ধিদের একটা হোটেলে ঢুকে প্রথমে এক বোতল ঠাররা (এক জাতের দিশি মদ) খেয়েছে জোহন, তারপর গলা পর্যন্ত ঠেসে-ঠেসে রুটি আর মাংস। খানপিনা হয়ে গেলে ঠার্‌রার নেশায় টলতে-টলতে সে চলে এসেছিল ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে; সেখান থেকে বারোটা পঁয়তাল্লিশে হারবার লাইনের লাস্ট ট্রেন ধরে বান্দ্রায় এসেছে।

সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মটা এখন একেবারে ফাঁকা। শুধু এই প্ল্যাটফর্মটাই নয়, অন্য প্ল্যাটফর্মগুলোতেও লোকজন চোখে পড়ছে না। চায়ের স্টল, খাবারের স্টল, মিল্ক বার, খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনের দোকান, ফলের স্টল, সব বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি, কালো কোট গায়ে দিয়ে যে টিকিট কালেক্টরগুলো অন্য সময়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদেরও এখন দেখা যাচ্ছে না।

পায়ে-পায়ে ওভারব্রিজের কাছে চলে এল জোহন। তারপর টলতে-টলতে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠতে লাগল। মিনিট পাঁচেক বাদে দেখা গেল স্টেশন পেরিয়ে সে বাইরের রাস্তায় চলে এসেছে। এখান থেকে বাস ধরে তাকে ডান্ডায় যেতে হবে। জোহন স্টেশনের উলটোদিকের বাস স্ট্যান্ডটায় গিয়ে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার হঠাৎ খেয়াল হল, স্ট্যান্ডে সে ছাড়া আর কেউ নেই। কীরকম একটা সন্দেহ হল জোহনের। নেশাজড়ানো ঘোলাটে চোখে এদিক-সেদিক তাকাতেই তার চোখে পড়ল, বাঁ-দিকের ফুটপাথে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে মাছভাজাওলারা বসে আছে। রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত ভাজা পমফ্রেট মাছ শালপাতায় সাজিয়ে ওরা বসে থাকে। কেন না আশে-পাশে অগুনতি বে-আইনি শুড়িখানা আর বার আছে। চাট হিসেবে ভাজা পমফ্রেট মাছের দারুণ ডিম্যান্ড।

মাছভাজাওলাদের কাছে এসে জোহন জিগ্যেস করল, ডান্ডার লাস্ট বাস কি চলে গেছে?

একটা মাছ ভাজাওলা বলল, হাঁ, আধা ঘণ্টা আগে।

তার মানে ঝাড়া তিনটি মাইল এখন জোহনকে হাঁটতে হবে। জড়ানো, চাপা গলায় সে বলল, 'যাঃ শালে—' বলেই এলোমেলো টলমলে পায়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে হেঁটে চলল। বাঁকের শপিং সেন্টার, নতুন সিনেমা হল, হোটেল, গেস্টহাউস পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সে লিংকিং রোডে এসে পড়ল। তারপর কোনাকুনি ডান্ডা কোস্টের দিকে এগুতে লাগল।

এত রাতে রাস্তায় লোকজন নেই। মাঝে-মধ্যে দু-একটা ফ্লাইং পুলিশ দেখা যাচ্ছে। ক্বচিৎ কখনও হুস করে জুহু বিচের দিকে থেকে এক-আধটা প্রাইভেট কার সত্তর-আশি মাইল স্পিডে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বান্দ্রা থেকে ডান্ডা কোস্ট পর্যন্ত রাস্তায়-রাস্তায় যে ফ্লাইং পুলিশের ঘুরে বেড়ায়, তারা সবাই জোহনকে চেনে। চলতে-চলতে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তারা কেউ-কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। একটা মারাঠি পুলিশ হাতের ভেতর কাঠের রুল ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল, ড্রেসটা তো দারুণ বানিয়েছিস; বিলকুল রাজা-রাজা মনে হচ্ছে!

জোহনের গায়ে যে পোশাক সেটা আনকোরা নতুন, আজই সে প্রথম পরেছে। তাদের 'আনারকলি ব্যান্ড পার্টি'-র ড্রেস রাজরাজড়াদের পোশাকের ঢং নকল করে বানানো হয়। জোহন ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে ডান হাতটা কপালের কাছাকাছি সেলামের ভঙ্গিতে তুলে বলল, আপনার মেহেরবানি।

রগড়ের গলায় পুলিশটি এবার বলল, তা রাজাসাব, এত তাকলিফ করে পায়দল যাচ্ছেন যে?

'রোজই তো এয়ার-কন্ডিশনড কারে চড়ে বেড়াই। আজ ভাবলাম একটু হাঁটি—' বলেই চোখ পিটপিট করতে লাগল জোহন।

'শালে হারামি—' আলতো করে জোহনের পাছায় রুলের খোঁচা দিয়ে পুলিশটা এগিয়ে গেল। আরও খানিকটা যাবার পর আর-একটি পুলিশের সঙ্গে দেখা হল। সে তার

মুখের কাছে নাক এনে গন্ধ শুকে বলল, 'অ্যাই, আজ আবার ঠাররা গিলেছিস!'

'হ্যাঁ—' ঘাড়টা আড়াই ফুট হেলিয়ে দিল জোহন, 'খেতে কি চাই, তবে না খেয়ে পারি না—'

কেন?

লস হয়ে যাবে যে—

কার লস হবে?

ওই যারা ঠাররা বানিয়েছে। মাল না কাটলে শালেলোগ রাস্তায় বসে যাবে। সেই জন্যেই তো খেতে হয়।

নেশার মধ্যেও করুণ মুখ করে বলল জোহন। পুলিশটা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল। তারপর আচমকা খেঁকিয়ে উঠল, 'দিল্লাগি! যা ভাগ, শরাবি কাঁহাকা—

জোহন ফ্যাক্ করে একটু হাসল। তারপর ঘাড় হেঁট করে টলতে-টলতে আবার এগিয়ে চলল। দ্বিতীয় পুলিশটির পর আর কারও সঙ্গে দেখা হল না। কতক্ষণ বাদে, জোহনের খেয়াল নেই, একসময় ডান্ডা কোস্টের কাছে চলে এল সে।

বান্দ্রা এবং খারের নতুন টাউনশিপটা যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর অনেকটা রাস্তা একেবারে নির্জন। তার দু-ধারে বাড়ি-টাড়ি নেই, এমনকি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে দু-চারটে আলো লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, কারা যেন সেগুলো খুলে নিয়ে গেছে। সুতরাং রাস্তাটা অন্ধকারও।

এই রাস্তাটা সমুদ্রের ধারে ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়পট্টিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। জোহন এই জনশূন্য ঘুটফুটে অন্ধকার রাস্তার আধাআধি যখন এসে পড়েছে, সেই সময় খুব কাছাকাছি কোথায় যেন ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়ে-গলার তীক্ষ্ণ কাতর চিৎকার হৃৎপিণ্ড ছিড়ে দিয়ে চলে গেল, 'বাঁচাও-বাঁচাও, মেরে ফেলল—'

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় টক্কর খেয়ে চলতে-চলতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল জোহন। পুরো এক বোতল ঠাররা তলপেটে নিম্নচাপ সৃষ্টি করছিল এবং মাথার ভেতর একটানা মেরি-গো-রাউন্ড ঘুরিয়ে যাচ্ছিল। পলকে নেশাটা ফিকে হয়ে এল। কোত্থেকে শব্দটা আসছে বোঝবার জন্য ভয়ে সে চারদিকে তাকাতে লাগল। একে অন্ধকার, তার ওপর নেশায় চোখ ভারী হয়ে প্রায় কুঁজে আছে। জোহন করল কি, দু-আঙুল দিয়ে ডান চোখের পাতা টেনে বড় করে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু না, কিছুই চোখে পড়ছে না। আচমকা তার মনে পড়ে গেল, পকেটে একটা লাইটার রয়েছে। ঝট করে সেটা বার করে জ্বালিয়ে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে আবছাভাবে তার চোখে পড়ল, কয়েক গজ দূরে দুটো ঢ্যাঙা চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বয়স-টয়স বোঝা যাচ্ছে না, তবে দু-জনেরই হাতে দুটো লম্বা ছোরা। লাইটারের আলোয় ছোরা দুটো ঝকঝকিয়ে উঠছে। তাদের পায়ের কাছে কেউ, একটা মেয়েই হবে হয়তো, পড়ে আছে। কারও নড়াচড়া নেই; সব মিলিয়ে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো সব স্থির। শরীরের সবগুলো জোড়ের মুখে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল যেন। জোহান একবার ভাবল, পেছন ফিরে দৌড় লাগায়। দৌড়তে গিয়ে দেখল, পেরেক ঠুকে পা দুটো যেন কেউ রাস্তার সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে। হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল সে, ভাঙা বসে-যাওয়া গলায় বলল, তোরা কে?

ঢ্যাঙা লোক দুটো, হত্যাকারীর মতো যাদের চেহারা, চাপা গলায় বলল, চোপ শালে, বাত্তি বুঝা (নিভিয়ে দে), নেহি তো পেটে ড্যাগার ঘুসিয়ে দেব।

ফুঁ দিয়ে লাইটারটা নেভাতে যাচ্ছিল জোহন, মুহূর্তে লোক দুটোর পায়ের তলা থেকে মেয়ে-গলার অস্পষ্ট গোঙানি উঠে এল। সঙ্গে-সঙ্গে মাথার ভিতরটা কীরকম জট পাকিয়ে গেল তার। শরীরের সবটুকু শক্তি গলায় জড়ো করে সে চিৎকার করে উঠল, 'মার্ডার-মার্ডার পুলিশপু-লিশ দুটো

আচমকা চিৎকারে লোকদুটো হ'কচাকিয়ে গেল। তারপর লাফ দিয়ে পাশের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিমেষে উধাও। মেয়েটা ওখানে পড়েই রইল।

এবার কী করবে। জোহন ভেবে পেল না। সমুদ্রের দিক থেকে যে উলটো-পালটা হাওয়া উঠে আসছিল, লাইটারটা তাতেই নিভে গেছে। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর অলৌকিক কোনও শক্তির টানে মেয়েটা যেখানে পড়ে আছে, পায়ে-পায়ে সেখানে চলে এল।

কাছে এসে লাইটারটা আবার জ্বালল জোহন। দমকা বাতাসে তক্ষুনি সেটা নিভে গেল। কিন্তু পলকের মধ্যে সে যা দেখল, ঠাররার নেশাটা তাতেই ছুটে গেল। চাপ-চাপ ঘন রক্তে অনেকটা জায়গা ভেসে গেছে আর তার মধ্যে মেয়েটা কাত হয়ে ঘাড় গুজে পড়ে আছে। জোহনের মনে হল, শরীরের হাড়গুলো গলে-গলে বেঁকেচুরে যাচ্ছে, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। একবার ভাবল, পালিয়ে যায়। কিন্তু পালাতেও পারল না। এ-অবস্থায় মেয়েটাকে ফেলে যাওয়া যায় না। চারদিকটা দ্রুত একবার দেখে নিয়ে শ্বাস-টানার মতো শব্দ করে জোহান ডাকল, 'অ্যাই—'

মেয়েটির দিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

জোহন আবার বলল, কে তুমি?

এবারও মেয়েটার উত্তর নেই।

আচমকা জোহনের খেয়াল হল, মেয়েটা মরে যায়নি তো? ভাবতেই মেরুদন্ডের মধ্য দিয়ে ঠান্ডা স্রোতের মতো কিছু নেমে গেল। নিজের অজান্তেই কাঁধ, কপাল এবং বুকে আঙুল ঠেকিয়ে একটা ক্রস আঁকল সে। তারপর ঘাড় থেকে ফ্লুটের বাক্সটা রাস্তায় নামিয়ে রেখে হাঁটু মুড়ে অন্ধকারেই আন্দাজে-আন্দাজে মেয়েটার মুখের ওপর ঝুঁকল। লাইটারটা আরেকবার জ্বেলে রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে উলটোপালটা বাতাসে যাতে নিভে না যায়, বাঁ-হাত দিয়ে তাই আড়াল করে রাখল, আর ডান হাতটা মেয়েটার নাকের কাছে ধরে বুঝতে চেষ্টা করল শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলছে কি না। অনেকক্ষণ পর, যোহনের মনে হল, তিরতির করে একটু নিশ্বাস পড়ল হাতের ওপর। ওহ, ক্রাইস্ট, মেয়েটা তবে এখনও মরেনি! হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিংবা ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে পারলে নিশ্চয়ই ওকে বাঁচানো যাবে। দ্রুত আরেকবার ক্রস আঁকাল জোহন। তারপর আবার ডাকতে লাগল, অ্যাই-অ্যাই—

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, জোহন বুঝতে পারল, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে আছে।

এখন ওকে কীভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়? যতদূর চোখ যায়, রাস্তায় লোকজন গাড়ি-টাড়ি কিছুই নেই। যে-কোনও একটা গাড়ি-প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, ট্রাক, ভ্যান, এমনকি বাস পর্যন্ত— দেখতে পেলে সেটা থামিয়ে ড্রাইভারের হাতে-পায়ে ধরে রাজি করিয়ে মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যেত। একটা লোক পেলেও দুজনে ধরাধরি করে যা হোক ব্যবস্থা করতে পারত জোহন। যাই হোক গলা চড়িয়ে চিৎকার করে-করে সে ডাকতে লাগল, আশেপাশে কেউ আছ? কোই হ্যায় ভাই?

কেউ উত্তর দিল না।

বান্দ্রায় ওয়াটারফিল্ড রোডে কর্পোরেশনের একটা হাসপাতাল আছে। কিন্তু সেটা প্রায় দুআড়াই মাইল দূরে। একা একটা অজ্ঞান মেয়েকে কাঁধে করে এতটা রাস্তা যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া হঠাৎ মনে হল, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রচুর লাফড়ায় (ঝামেলায়) পড়তে হবে। মেয়েটা তার কে? কোথায় তাকে পেয়েছে? তার এমন অবস্থা হল কীভাবে? এ-সব প্রশ্নের জবাবদিহি করতে করতে তার লাইফ হেল হয়ে যাবে। তারপর পুলিশের লাফড়ায় পড়তে হবে কি না, কে জানে। তার চাইতে, জোহন স্থির করে ফেলল, আপাতত মেয়েটাকে তাদের ঝোপড়াপট্টিতেই নিয়ে যাবে। কথাটা ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়ল, আরো তাদের ঝোপড়পট্টিতেই তো একটা বুড়ো পার্শি ডাক্তার রয়েছে। লাইটারটা নিভিয়ে পকেটে পুরল জোহন। তারপর মেয়েটাকে কাঁধে তুলে ফ্লুটের লম্বাটে বাক্সটা এক হাতে ঝুলিয়ে এগিয়ে চলল। যেতে-যেতে অন্ধকারেই সে টের পেতে লাগল, মেয়েটার শরীর থেকে রক্ত চুইয়ে-চুইয়ে তার জামা-টামা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্রের ধার ঘেঁষে অনেকটা জায়গা জুড়ে ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়াপট্টি। ভাঙাচোরা টিন, অ্যাসবেস্টসের টুকরো, টালি, প্যাকিং বাক্সের পাতলা কাঠ, বাতিল চট-ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে শুয়োরের খোয়াড়ের মতো একটানা সারি-সারি অগুনতি ঘর তোলা হয়েছে। এই হল ঝোপড়পট্টি।

বোম্বাই শহরে হাজার-হাজার চোখ-ধাঁধানো বাড়ি, গন্ডা-গন্ডা স্কাইস্ক্রেপার। মডার্ন আর্কিটেকচারের যত নমুনা আছে, সব এখানকার রাস্তায়-রাস্তায় ছড়ানো। তবু ওগুলোর গা ঘেঁষে এই নোংরা-কুৎসিত ঝোপড়াপট্টিগুলোও আছে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ জীবাণুর মতো এর ভেতর গাদাগাদি করে পড়ে থাকে। ডান্ডা কোস্টের এই ঝোপড়াপট্টির একাধারে থাকে মারাঠি জেলেরা; আরেক দিকে নানা জাতের মানুষ-বিহারি, বাঙালি, কেরেলি, কুগি গোয়াঞ্চি ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝোপড়াপট্টিগুলো ছোটখাটো একএকটি ভারতীয় প্রজাতন্ত্র যেন।

ডান্ডা কোস্টের এই ঝোপড়পট্টিটার শেষ মাথায় একটা ঘরে থাকে যোহন। কিছুক্ষণ পর মেয়েটাকে নিয়ে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। মেয়েটাকে কাঁধে রেখেই পকেট হাতড়ে চাবি বার করে তালা খুলল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেওয়ালের গা থেকে তারে-ঝোলানো সুইচটা বার করে আলো জ্বালল।

ঝোপড়াপট্টিতে বম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই আলো-টালো দেয়নি। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ-কেউ চুরি করে কর্পোরেশনের রাস্তার লাইট থেকে কানেকশন নিয়ে আলো জ্বালায়। জোহনও লম্বা তার-ফার লাগিয়ে একটা চোরা গোপ্তা কানেকশান নিয়েছে। ক্বচিৎ কখনও ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লোকেরা ইন্সপেকশনে এলে পাঁচ-দশটি টাকা হাতে ধরিয়ে দেয়।

ঘরটা আলোয় ভরে গিয়েছিল। একাধারে দড়ির খাটিয়ার ওপর নোংরা ধোমসানো বিছানা। আরেক ধারে সস্তা দামের একটা টেবিলে পারা-ওঠা আয়না, চিরুনি, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, দুটো হাতল-ভাঙা কাপ, একটা প্লাস্টিকের গেলাস এবং একটা অল্প দামের ট্রানজিস্টর। টেবিলটার তলায় হাট করে খোলা একটা টিনের বাক্স, এক কোণে দড়িতে ঝোলানো দুটো পায়জামা, একটা শার্ট, নোংরা গেঞ্জি, চিটচিটে রুমাল। এক দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি, আরেক দেওয়ালে একটা হুইস্কি কোম্পানির ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ক্যালেন্ডারটার গোটা পাতা জুড়ে প্রায়-উলঙ্গ একটি মেমসাহেব বিরাজ করছে।

মেয়েটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল জোহন, তারপর ফ্লুটের বাক্সটাকে দেওয়ালের একটা হুঁকে ঝুলিয়ে রেখে আবার মেয়েটার কাছে এসে দাঁড়াল। এতটা রাস্তা একটা মানুষের অজ্ঞান দেহের ভার বয়ে এনেছে জোহন; দারুণ হাঁপাচ্ছিল সে। কপালে ঘাড়ে গলায় দানাদানা ঘাম জিমেছে। হাঁপাতে-হাঁপাতেই সে মেয়েটাকে দেখতে লাগল।

অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা যায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে মেয়েটার বয়স খুব বেশি হবে না, এই পঁচিশ-ছাব্বিশের মতো। মুখের গড়ন বেশ ধারালো, রং পাকা গমের মতো। চোখ বুজে আছে, তবু বোঝা যাচ্ছে সে দুটো বেশ বড়-বড় এবং তাতে লম্বাটে টান। প্রচুর চুল মেয়েটার, সরু কোমর, তীক্ষ্ণ নাক, দীর্ঘ আঙুল। তবে গোটা শরীরটাই প্রায় রক্তে মাখামাখি।

হঠাৎ কী মনে পড়তে দ্রুত একটা হাত মেয়েটার নাকের কাছে এনে নিশ্বাসপতন লক্ষ করল জোহান; পরীক্ষণে সেই হাতটা কপালের ওপর রেখে শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে একরকম দৌড়ুতে-দৌড়ুতে ঝোপড়াপট্টির আর-এক মাথায় একটা ঘরের সামনে এসে থামাল। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল, ডাক্তারসাব, ডাক্তারসাব—

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে ঘুম-জড়ানো গলা শোনা গেল, 'কৌনা?'

আমি জোহন, জোহন ফ্লুটবালা—

একটু পরেই দরজা খুলে যে সামনে দাঁড়াল তার নাম ডাক্তার গিল্ডার। বয়স সাতষট্টি-আটষট্টি। জাতে পার্শি। মাঝারি মাপের চেহারা। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। এত বয়স হয়েছে। তবু স্বাস্থ্য বেশ ভালো; পেটানো মজবুত শরীর। চৌকো মুখ, ধূর্ত

নীলচে চোখ।

গিল্ডার একসময় বম্বে মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রিওলা ডাক্তারই ছিল। বিশ-পঁচিশ বছর আগে বেআইনি গর্ভপাত করবার সময় তার হাতে একটি মেয়ের মৃত্যু ঘটে। তাই নিয়ে প্রচুর ঝঙ্কাট হয়েছে। পুলিশ এসেছে, কোর্টে তার বিরুদ্ধে কেস উঠেছে এবং মামলায় দোষী প্রমাণিত হয়ে দু-মাস জেলও খাটতে হয়েছে গিল্ডারকে। সেই সঙ্গে ডাক্তারি ডিগ্রি এবং রেজিষ্ট্রেশন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। নামকটা ডাক্তার গিল্ডার জেল থেকে বেরিয়ে নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষপর্যন্ত এই ডান্ডা কোস্টে এসে ঠেকেছে। এই ঝোপড়াপট্টিতেই তার ষোলো-সতেরো বছর কেটে গেল। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে সে প্র্যাকটিস-ট্র্যাকটিস করে। তা ছাড়া কাছাকাছি একটা বে-আইনি হতচ্ছাড়া চেহারার বেশ্যাপট্টি আছে, সেখানেও বেশ জমজমাট পাসার গিল্ডারের। তবে পসার যতটা, সেই তুলনায় পয়সা নেই। এখানকার মানুষগুলো দু-বেলা পেট ভরে খেতেই পায় না, ডাক্তারের পয়সা দেবে কোত্থেকে? যে যা দ্যায়, চোখ বুজে তাই পকেটে পোরে গিল্ডার! নামকাটা ডাক্তারের ফি-র দিকে তাকালে চলে না।

চোখ রাগড়াতে-রগড়াতে ডাক্তার গিল্ডার জিগ্যেস করল, এত রাত্তিরে! কী ব্যাপার রে?

জোহন বলল, ফেঁসে গেছি। ডাক্তারসাব। আপনাকে একবার আমার ঝোপড়িতে যেতে হবে।

কী হয়েছে?

একটা লড়কি বিলকুল বেহুঁশ হয়ে রয়েছে; তাকে দেখতে হবে। গিল্ডারের

ঘুমন্ত ভাবটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে কেটে গেল যেন। সে বলল, লড়কি! তুই তো ব্রিফ আকেলা নাঙ্গা আদমি, শাদ্দি-টাদি করিসনি। লড়কি পেলি কোথায়? ভাগিয়ে এনেছিস নাকি?

আপনি চলুন, যেতে-যেতে বলছি।

গিল্ডার বুঝল, বেহুঁশ মেয়েটার জন্য অস্থির হয়ে আছে জোহন; সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে নিয়ে যেতে চায় সে। যে ঢলঢলে প্যান্টটা পরা ছিল, তার ওপর একটা কোঁচকানো-মোচকানো বুশ শার্ট চড়িয়ে পেটমোটা ঢাউস ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল গিল্ডার। দরজায় তালা লাগিয়ে বলল, চল—'

ঝোপড়াপট্টির ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা নোংরা রাস্তা দিয়ে ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। এই রাস্তাগুলো যুগপৎ নর্দমা এবং পায়ে চলার পথ। দু-ধারের ঝোপড়িগুলো থেকে যত ময়লা জল, আবর্জনা, আনাজের খোসা এখানে ছোড়া হয়। এক-এক জায়গায় ডাঁই করা আবর্জনা পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে।

যেতে-যেতে সংক্ষেপে মেয়েটাকে কোথায় পেয়েছে এবং কী অবস্থায় ঝোপড়াপট্টিতে তুলে এনেছে, বলে গেল জোহান।

সব শুনে গভীর, চিন্তিত মুখে গিল্ডার বলল, তাই তো; পুলিশের ঝামেলা-ফামেলায় না আবার পড়ে যাস—

জোহনের গলা শুকিয়ে গেল, কী হতে পারে ডাক্তারসাব?

গিল্ডার এই ঝোপড়াপট্টির বাসিন্দাদের রোগ-টোগই শুধু সারায় না; সে তাদের পরামর্শদাতাও। কেউ বিপদে পড়লে তার কাছে ছুটে আসে। গিল্ডার আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে রাগের সুরে বলল, আগে মেয়েটাকে দেখি।

ভয়ের কিছু নেই তো?

ভেবে দেখতে হবে।

একসময় ওরা জোহনের ঝুপড়িতে এসে পড়ল।

মেয়েটাকে জোহন যেভাবে শুইয়ে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই কত হয়ে পড়ে আছে সে। চোখ তেমনই বেঁজো। জোহন তাকে দেখিয়ে বলল, এই যে, এর কথা বলছিলাম

—

গিল্ডার ঢাউস ব্যাগটা পাশে রেখে মেয়েটার হাত তুলে নিয়ে পালস দেখতে লাগল। জোহন তার গা ঘেষে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল। মিনিটখানেক বাদে মেয়েটার হাত নামিয়ে গিল্ডার ঘাড় ফেরাতেই জোহন শ্বাসরুদ্ধের মতো জিগ্যেস করল, কীরকম দেখলেন ডাক্তারসাবা?

ভালো না।

বাঁচবে তো? ঘরে এনে তোলার পর যদি মরে যায়, আমি গেছি—

ভয় নেই, বেঁচে যাবে। তবে তোকে বেশ ভোগাবে। এক কাজ কর—খানিকটা গরম জল দরকার। জোগাড় করতে পারবি?

পারতেই হবে।

জোহনের এই ঝুপড়িতে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই, কাজেই বাসন-কোসনও নেই। তার খাওয়াদাওয়া সবই বাইরে-বাইরে, কখনও উদিপিদের লাঞ্চ হোমে; কখনও সিন্ধি, পাঞ্জাবি বা গোয়াঞ্চিদের হোটেলে। খিদের সময় কাছাকাছি যা পাওয়া যায়, সেখানেই ঢুকে পড়ে জোহন।

হাঁড়ি-কড়া বাসন-কোসন না থাকলেও এই ঝুপড়িতে একটা পুরোনো জং-ধরা কোরোসিনের কুকার আছে। জোহনের দারুণ চায়ের নেশা। ঘণ্টায় দু-বার করে তার চা চাই। ঝুপড়িতে যখন সে থাকে কুকার ধরিয়ে চা-টা নিজের হাতেই করে নেয়।

টেবিলের তলা থেকে কুকারটা বার করে ধরিয়ে ফেলল জোহন। তারপর দশ মিনিটের ভেতর টিনের মাগে জল গরম করে গিল্ডারের কাছে নিয়ে এল।

গিল্ডার তার প্রকাণ্ড ব্যাগ থেকে তুলো বার করে গরম জলে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে মেয়েটার রক্ত মুছতে লাগল। ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করতে-করতে আঁতকে ওঠার মতো করে বলল, ওহ, অনেক জায়গায় স্ট্যাব করেছে।

গিল্ডারের পাশ থেকে জোহান অস্পষ্ট গলায় বলে উঠল, হ্যাঁ—

গিল্ডার বলল, মেয়েটার শাড়ি ব্লাউজ রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে; এগুলো বদলাতে হবে যে—

এবার দারুণ বিপদে পড়ে গেল জোহন। তার ঝুপড়িতে কি বিয়ে করা বউ আছে, যে শাড়িটাড়ি থাকবে? কিন্তু ওই মেয়েটার রক্তমাখা কাপড়-চোপড় বদলাবার জন্য এখন কী দেয় সে? এত রাতে এই ঝোপড়াপট্টিতে কেউ জেগেও নেই। থাকলে না হয় কারও কাছ থেকে শাড়ি-ফাড়ি চেয়ে আনা যেত। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত নিজের একটা পায়জামা আর বুশ শার্ট এনে গিল্ডারের হাতে দিল যোহন।

গিল্ডার মজার গলায় বলল, এগুলো মেয়েরা পরে নাকি?

ঘাড় চুলকে জোহন বলল, আপনি তো জানেন ডাক্তারসাব, মেয়েমানুষের লাফড়া আমার ঘরে নেই; শাড়ি কোথায় পাব? এই দিয়েই কাজ চালিয়ে দিন।

'শালে হারামি—' বলেই একটা খিস্তি দিল গিল্ডার। তার জিভ বেশ আলগা; সেখানে কিছুই আটকায় না।

জোহন ঠোঁট কুঁচকে হাসল, কিছু বলল না। আর গিল্ডার এক কাণ্ডই করে বসল। জোহনের চোখের সামনে মেয়েটার শাড়ি জামা-টামা খুলে কাটা জায়গাগুলো সেলাই করে দিতে লাগল।

যুবতী মেয়ের খোলা শরীর আগে আর কখনও দেখেনি জোহন। মেয়েটার জ্ঞান নেই। দেহ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত আর জোহনের বয়সও কিছু কম নয়। পঞ্চাশের কাছাকাছি, তবু মেয়েটাকে দেখতে-দেখতে তার চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল, নাকের ভেতর দিয়ে সোডার ঝাঁজের মতো কিছু উঠে আসছিল, তালুর কাছটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল।

এদিকে সেলাই-টেলাই হয়ে গেলে হাত-টাত ধুয়ে গিল্ডার মেয়েটাকে পায়জামা আর বুশ শার্ট পরিয়ে একটা ইঞ্জেকশান দিল। ব্যাগ থেকে অনেকগুলো ট্যাবলেট বার করে

কাগজে মুড়তেমুড়তে বলল, ‘জ্ঞান ফিরলে দু-ঘণ্টা পরপর একটা করে খাইয়ে দিবি। কাল সন্ধেবেলা এসে আবার ইঞ্জেকশান দিয়ে যাব। রোজ একটা করে সাত দিন ইঞ্জেকশান চলবে।’ বলতে-বলতে তার ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল—‘দে, ওষুধের দামটা দিয়ে দে।’

তালুর ভেতর সেই ঝাঁ-ঝাঁ করা ভাবটা এখনও রয়েছে। ঘোরের মধ্যে জোহন জিগ্যেস করল, ক’ত?

দশ টাকা।

ব্যান্ডপার্টিতে একদিন বাজালে তার মজুরি কুড়ি টাকা। আজকের মজুরি থেকে এক বোতল ঠাররা আর রুটি মাংস খেয়েছে সে, তাতে খরচ হয়েছে ছটাকার মতো। বাকি চোদ্দোটা টাকা এখনও রয়েছে। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে গিল্ডারকে দিল জোহন।

গিল্ডার একটু চুপ করে থেকে হোসে-হেসে বলল, আমার ফি-টি কিছু দিবি না?

আরও দুটো টাকা বার করে নিঃশব্দে গিল্ডারকে দিল জোহন। তার মানে আজকের মজুরির পুরোটাই প্রায় খতম।

পকেটে টাকা পুরতে-পুরতে গিল্ডার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কী মনে পড়তে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, ‘আজকের রাতটা পারলে মেয়েটার কাছে জেগেই কাটাস। জ্ঞান ফিরে এলে ওর যদি খুব যন্ত্রণা হয়, আমাকে খবর দিবি।’

জোহান ঘাড় কাত করল—দেবে।

দরজার বাইরে গিয়ে গিল্ডার আবার বলল, আরেকটা কথা—

জোহন তাকিয়ে রইল। গিল্ডার বলতে লাগল, ঝোপড়াপট্টির লোকেরা অবশ্য মেয়েটা তোর কে হয় জানতে চাইবে না। এখানে কেউ কারওকে নিয়ে মাথা ঘামায় না; কিন্তু ওর এমন অবস্থা হল কী করে যদি জিগ্যোস করে, তখন কী বলবি?

জোহন প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, কী বলব?

বলবি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। মেয়েটার জ্ঞান ফিরলে ওকেও তাই বলতে বলে দিস।

আচ্ছা।

সত্যি কথা বললে আবার পুলিশের লোকেরা এসে যেতে পারে।

গিল্ডার চলে গেল। জোহন দরজা বন্ধ করে মেয়েটার কাছে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। মেয়েটা চোখ বুজে পড়ে আছে। এবার জোহনের মনে হল, আস্তে-আস্তে মেয়েটার শরীরে জীবন যেন ফিরে আসছে। তিরতির করে বুকটা ওঠানামা করছে। বেঁচে যাবে মেয়েটা, নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। তাকে দেখতে-দেখতে হঠাৎ জোহনের খেয়াল হল ব্যান্ডপার্টির যে ড্রেস তার গায়ে রয়েছে, সেটা রক্তে মাখানো। রক্তের দাগ সহজে ওঠে না। এখনও ধুয়ে-টুয়ে ফেললে ড্রেসটা খানিকটা হয়তো বাঁচানো যাবে। অল্প-স্বল্প দাগ থাকলেও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। নইলে দামি নতুন ড্রেসটাই বরবাদ।

ঝোপড়াপট্টির মধ্যেই একটা জলের কল আছে। আন্ডারগ্রাউন্ডে কোনও একটা পাইপটাইপ ফেটে যাবার জন্য দিনরাত ওটা দিয়ে জল পড়ে। জোহন ঝট্ করে একটা পায়জামা আর জালিকাটা গোলাপি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ব্যান্ডপার্টির ড্রেস আর মেয়েটার শাড়ি জামা-টামা নিয়ে কাল থেকে ধুয়ে আনল। ভেজা পোশাকগুলো ঘরেই শুকোতে দিয়ে আবার মেয়েটার কাছে এসে বসল।

আজ গোটা রাতই মেয়েটার পাশে বসে জেগে থাকতে হবে। ডাক্তার গিল্ডার তাই বলে গেছেন। ঝাড়া দশ-বারো ঘণ্টা ফুলুট বাজিয়ে হাতে-পায়ে আর জোর নেই, দারুণ খটুনি গেছে। জোহন ভেবেছিল, ঝোপড়পট্টিতে ফিরেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে। তারপর পরিপাটি একটি ঘুমে রাত কাবার করে ফেলবে। তা নয়, কী যে লাফড়া হয়ে গেল! মেয়েটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে না আনলেই বোধহয় ভালো হতো। ঘুমের বারোটা তো বেজেই গেছে, মজুরির

যে-টাকাটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটাও মেয়েটার জন্যই প্রায় শেষ হয়ে গেল। এরপর আরও কত খরচ-টরচ, আরও কত ঝামেলা পোয়াতে হবে, কে জানে।

ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে এনে ঢোকানো ঠিক হয়নি। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠতে গিয়ে আচমকা মেয়েটার নগ্ন খেলা শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে নাকে-মুখে সেই সোডার ঝাঁজটা ফের অনুভব করতে শুরু করল জোহন।

মেয়েটার জ্ঞান ফিরল ভোরের দিকে।

সারা রাত চোখের পাতা টান-টান করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল জোহন। এক মুহূর্তের জন্যও সে ঘুমোয়নি; মাঝে-মধ্যে ঢুলুনি এলেও জোর করেই চোখ মেলে রেখেছে!

মেয়েটা তাকাতেই জোহন তার মুখের ওপর ঝুঁকল। তার চোখ ঘোলাটে, আচ্ছন্ন। গলার ভেতর থেকে আবছা গোঙানির মতো শব্দ বেরিয়ে আসছিল। জোহন জিগ্যেস করল, এখন কেমন লাগছে?

মেয়েটা উত্তর দিল না; তার চোখ দুটো ক্লান্তভাবে বুজে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার যখন সে তাকাল তার চোখের সেই আচ্ছন্ন ঘোলাটে ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। ঝুপড়ির ভেতরটা দেখতে-দেখতে খুব দুর্বল গলায় বলল, আমি কোথায়?

জোহন বলল, ডান্ডার ঝোপড়াপট্টিতে।

এখানে এলাম কী করে?

মেয়েটা হিন্দিতেই কথা বলছিল। তা থেকে তার দেশ কোথায়, কী জাত, বোঝা যাচ্ছিল না। কেন না বাঙালি-বিহারি-পাঞ্জাবি-কোরেলি সবাই বম্বেতে হিন্দি বলে থাকে। তবে মেয়েটার বলার ধরনে কুর্গ অঞ্চলের টান আছে।

জেহন বলল, পরে শুনো। এখন শরীর কেমন লাগছে বলো—

'খুব দুবলা, মাথা ঘুরছে।' বলতে-বলতে হাতের ওপর ভর দিয়ে হঠাৎ উঠে বসতে চেষ্টা করল মেয়েটা। কিন্তু সে বসবার আগেই তার দু-কাঁধ ধরে ব্যস্তভাবে শুইয়ে দিল জোহন। 'উঁহু-উঁহু, এখন উঠো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো।'

শুয়ে-শুয়ে মেয়েটা জিগ্যেস করল, তুমি কে?

আমার নাম জোহন।

তুমিই আমাকে এখানে এনেছ?

হ্যাঁ।

আমাকে কোথায় পেলে?

পরে বলব।

চোখ আধাআধি বুজে কিছু ভাবতে চেষ্টা করল মেয়েটা। তার কপালে এলোমেলো আঁচড়ের মতো অনেকগুলো রেখা ফুটে উঠতে লাগল। একসময় কী যেন মনে পড়ে গেল তার। জোহনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল 'দুটো লোক কাল রাত্তিরে আমাকে ডান্ডার দিকে এনে সারা গায়ে ছুরি মেরেছিল। মনে আছে হাত তুলে ছুরি ঠেকাতে-ঠেকাতে অজ্ঞান হয়ে আমি রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।' একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি কি রাস্তা থেকে আমাকে তুলে এনেছিলে?'

হ্যাঁ।

সেই লোকদুটো তখন কোথায় ছিল?

ওই ব্যাপারটা নিয়ে এখন কোনও কথা বলতে চাইছিল না জোহন। প্রচুর রক্তপাতের ফলে মেয়েটার শরীর দুর্বল হয়ে আছে। তাছাড়া সারা রাত সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। এখন যে-কোনও উত্তেজনা তার পক্ষে ক্ষতিকর। জোহন বলল, 'পরে শুনো।' বলতে-বলতেই গিল্ডারের কথা মনে পড়ে গেল তার।

গিল্ডার বলে গিয়েছিল, জ্ঞান হবার পর মেয়েটার শরীরে যদি খুব যন্ত্রণা হয়, তাকে

যেন জোহান খবর দেয়। জোহন মেয়েটার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল তার কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে কি না।

মেয়েটা মাথা নাড়ল-হচ্ছে না।

তার মানে গিল্ডারকে এখন খবর দেবার দরকার নেই। সন্ধেবেলা সে নিজে থেকেই এসে ইঞ্জেকশান দিয়ে যাবে। গিল্ডারের কথা ভাবতেই জোহনের হঠাৎ খেয়াল হল, জ্ঞান হবার পর মেয়েটাকে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিতে হবে। সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ট্যাবলেট আর জল এনে খাইয়ে দিল। পরক্ষণেই জোহনের মনে পড়ল, আজ ফাস্ট ট্রেন ধরে তার সিটিতে যাবার কথা ছিল। তাদের 'আনারকলি ব্যান্ড-পার্টি'-র মালিক এবং ব্যান্ড মাস্টার ইফতিকার সাহেব ভোরবেলাতেই দলের সবাইকে অফিসে চলে যেতে বলেছিল। আজ নতুন বাজনার রিহার্সাল শুরু হবে।

জোহন দ্রুত একবার ফালিমতো জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকাল। এতক্ষণে বেশ রোদ উঠে গেছে।

বাইরে ঝোপড়পট্টির মাঝমধ্যিখানে সেই একমাত্র জলের কলটা ঘিরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। বহু লোকের কথা বলা এবং যাতায়াতের আওয়াজ ভেসে আসছিল। জোহন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইফতিকার সাহেব মানুষটা এমনিতে চমৎকার-ভোলাভালা, সাদাসিধে, আকাশের মতো বিরাট দিল, দলের লোকেদের বিপদে-আপদে দশ হাত দিয়ে আগলায়। কিন্তু কাজের গাফিলতি দেখলে একেবারে খেপে যায় সে। বাপ-মা চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে খিস্তি দেয়। জোহন ঠিক করে ফেলল এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে সে। কিন্তু এই মেয়েটা? একে কে দেখবে? ভারী গাড্ডায় পড়া গেল তো মেয়েটাকে নিয়ে।

হঠাৎ কী মনে পড়তে জোহনের মুখ চকচক করে উঠল। মুশকিল আসানের আভাস সে পেয়ে গেছে। মেয়েটার দিকে ফিরে দ্রুত বলল, তোমার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।

মেয়েটা বলল, মেরি সরোজিনী দেবাসিয়া। তবে সবাই আমাকে 'মেরি' বলে ডাকে।'

কথা বলার ধাঁচ শুনে জোহন যা আন্দাজ করেছিল তাই, অর্থাৎ মেয়েটা কুর্গিই। দেবাসিয়া পদবি কুর্গ ছাড়া আর কোথায়ও পাওয়া যাবে না। সে অবাক এবং কিছুটা খুশিও হল এই ভেবে, মেয়েটা সম্ভবত ক্রিশ্চানও। মেরি নামটা অন্তত তা-ই বোঝাচ্ছে। আগ্রহের সুরে জোহন জিগ্যেস করল, তুমি ক্রিশ্চান?

হ্যাঁ।

কী ক্রিশ্চান?

ক্যাথলিক।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে জোহন এবার বলল, তুমি একটু একলা থাকো, আমি আসছি।' বলেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ঝোপড়াপট্টির ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিকে যেতে-যেতে জোহন দেখল, মেয়েমানুষ-পুরুষমানুষবাচ্চ-কাচ্চা-এখানকার যত বাসিন্দা, কেউ আর ঝুপড়ির ভেতরে নেই। রোদ উঠতে না উঠতেই বেরিয়ে পড়েছে। জোহনকে ডেকে কেউ-কেউ কথা বলছিল। সে কেমন আছে, এত সকালে হনহনিয়ে কোথায় চলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হাঁটতে-হাঁটতেই জোহন উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। তবে যত বাচ্চার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, তারা আবদারের গলায় একই কথা বলে যাচ্ছিল, 'জোহন চাচা, তুমি আজকাল আমাদের ফুলুট শোনাও না। আজ শোনাতে হবে কিন্তু। না শোনালে ছাড়ব না।'

জোহন সময় পেলেই ঝোপড়াপট্টির কাচ্চা-বাচ্চাদের জড়ো করে ফ্লুটে নানারকম মজার মজার গান বাজিয়ে শোনায়-বেশির ভাগই হিন্দি ছবির গানের সুর। বয়স্ক লোকজনের চাইতে ছেলে-পুলেদের মধ্যেই তার খাতিরটা বেশি। যেতে— যেতে হাত তুলে-তুলে জোহন তাদের বলল, 'আজ না, আরেক দিন শোনাব।'

দশ মিনিটের মধ্যে ঝোপড়াপট্টির শেষ মাথায় একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল

জোহন। ঘরটার সামনের দিকের বারান্দায় বসে আজবলাল আর তার বউ এখন কলাই-করা মগে করে চা এবং পাও (পাউরুটি) খাচ্ছে। আজবলাল ইউ পি-র লোক, এখানে সকলে তাকে বলে ভাইয়া। তবে বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা। এই বয়সেও একটা চুল পাকেনি, গোলাকার মুখে বসন্তর দাগ, গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো। লোকটা চাকরি-বাকরি বা ব্যাবসা-ট্যাবসা কিছুই করে না; তার একমাত্র ধান্দা হল জুয়া খেলা। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে বম্বে শহরে এসেছিলসে; তারপর থেকে জুয়া খেলা ছাড়া আর কিছুই করেনি। জগতে যত রকমের জুয়া আছে-সাট্টা, মটকা, তাসের বাজি, ঘোড়ার রেস, কোনওটাতেই আজবলালের অরুচি নেই। জুয়ার পয়সাতেই তার সংসার চলে। বছর দশেক আগে এক সাট্টা খেলার আড্ডাতে তার সঙ্গে জোহনের আলাপ; সেই আলাপ থেকে পরে বেশ গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছে।

আজবলালের বউ সোমবারি বেশ গাবাদী-গোবদা মেয়েমানুষ। লম্বা যতটা, চওড়াও সে প্রায় ততখানিই। অনেকটা জায়গা জুড়ে, প্রায় দু-তিন মিটার হবে, সে বসে আছে। গোলগাল মুখ, অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেছে। আজবলালের তুলনায় তার বয়স ঢের বেশি মনে হয়। তবে সোমবারির সব আকর্ষণ তার চোখে; সর্বক্ষণ সেখানে কৌতুকের ছটা ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। ছড়া কেটে-কেটে আর হেসে-হেসে গানের সুরে উত্তরপ্রদেশের দেহাতি বুলিতে সে মুখরোচক অশ্লীল কথা বলে যেতে পারে। দারুণ মজার মেয়েমানুষ।

জোহনকে দেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, আরো আও-আও ফুলুটবালা—

জোহন বারান্দায় উঠে ওদের পাশে গিয়ে বসল। আজবলাল আবার বলল, দু-মাস বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হল। কাম-কাজ বহুত জোর চলছে না কি?

হ্যাঁ; এখন শাদির মরশুম তো। হাতে অনেক বায়না আছে।

আজ ছুটি বুঝি?

না। এক্ষুনি সিটিতে ছুটতে হবে।

তবে এলে যে? কিছু দরকার আছে?

হাঁ, বহুত দরকার। শোন—

জোহন বলতে যাচ্ছিল, তার আগে হাত তুলে সোমবারি বাধা দিল, দরকারের কথা পরে হবে, আগে তো চা খাও।

বলেই হাতের ভর দিয়ে নিজের বিশাল শরীর টেনে তুলল।

জোহন হাঁ-হাঁ করে উঠল, না ভাবী, এখন আর চা খাব না। দরকারি কথাটা সেরেই স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

সোমবারি বলল, 'চা না খেলে তোমার কোনও কথা শুনছি না।' ঘর থেকে স্টোভ বার করে এনে চটপট চায়ের জল চড়িয়ে দিল সে। ক্ষিপ্র হাতে চা করে, সঙ্গে পাও সাজিয়ে জোহনকে দিতে-দিতে বলল, 'এবার দরকারি কথাটা বলো—'

চায়ের মগে লম্বা চুমুক দিয়ে জোহন বলল, 'ভাবী, আমি স্রিফ মরে গেছি।'

ঠোঁট টিপে কিছুক্ষণ ছোট-ছোট চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল সোমবারি। তারপর বলল, কোনও লড়কির চকরে পড়েছ নাকি?

তোমার জবাব নেই ভাবী, ঠিক ধরেছ।

বয়েস কত মেয়েটার?

ঠিক জানি না; চব্বিশ-পাঁচিশ হবে। আর কি—

একটু চিন্তা করে সোমবারি জিগ্যেস করল, আর তোমার?

অবাক হয়ে জোহন বলল, আমার বয়েস দিয়ে কী হবে?

বলোই না—

পঁচাশের (পঞ্চাশ) মতো; দু-এক বছর কমও হতে পারে।

সোমবারির মুখে একটা ছায়া কিছুক্ষণের জন্য অনড় হয়ে রইল। তারপর ঠোঁট

কামড়াতে-কামড়াতে সে বলল, তর তো সত্যনাশ (সর্বনাশ) হে গিয়া—

এতক্ষণ চুপচাপ চা-পাউরুটি খেয়ে যাচ্ছিল আজবলাল। এবার সে বলে উঠল, বিলকুল—

জোহন চমকে উঠল, ক্যা হো গিয়া?

সোমবারি বলল, সত্যনাশ। এই বয়েসে একটা জওয়ানি ছোকরিকে খেলিয়ে তুলতে পারবে তো ফুলুটবালা?

দেখো দেখি, কী ভাবতে এরা কী ভেবে বসে আছে। জোহন বলল, খেলাবার কথা আসছে কীসে? মাজাক (ইয়ারকি) না করে আমার কথাটা আগে শুনেই নাও না—

ভালোমানুষের মতো মুখ করে সোমবারি বলল, আচ্ছা বলো—

মেরির ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে সোমবারির মুখের দিকে তাকাল জোহন, এবার বুঝতে পারছ তো, কীরকম ফেঁসেছি! তুমি আমাকে বাঁচাও ভাবী।

কী করতে হবে বলো—

মেয়েটায় সবে জ্ঞান ফিরেছে। ওর কাছে একজন থাকা দরকার। এদিকে আমাকে বেরুতে হচ্ছে। তুমি যদি ওর কাছে থাকো, তাহলে আমি ভরসা করে বেরুতে পারি।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না সোমবারি। স্বামীর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, তুমি কি আজ বেরুবে, না ঘরেই থাকছ?

আজব লাল বলল, ঘরে বসে থাকলে চলবে? আজি মহালছমিতে ঘোড়ার রেস আছে না? ঘণ্টাখানেকের ভেতর বেরিয়ে পড়বা।

ভালোই হল। রান্না-টান্নার ঝামেলা আর করছি না। তুমি হোটেলে খেয়ে নিও। ঘরে বাসি রুটি আছে, তাই দিয়ে আমি চালিয়ে নেব। এখন ফুলুটবলার সঙ্গে যাচ্ছি। বেরুবার সময় ঘরে তালা লাগিয়ে আমাকে চাবিটা দিয়ে যেও—' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল সোমবারি। জোহনের দিকে ফিরে বলল, চলো।

সোমবারিকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ বাদে নিজের ঝুপড়িতে ফিরে এসে জোহন দেখল, মেরি খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি এখন বেশ স্বাভাবিক; আগের সেই আচ্ছন্নতা আর নেই। জোহানদের দেখে সে উঠে বসতে চাইল, জোহন উঠতে দিল না। হাতের ইশারায় তাকে শুয়ে থাকতে বলে সোমবারিকে দেখিয়ে বলল, এ আমার ভাবী; তোমার কাছে থাকবে। আমাকে এখন কাজে বেরুতে হচ্ছে।

নিঃশব্দে ঘাড় কত করল মেরি।

সোমবারির দিকে ফিরে জোহন বলল, এই হল মেরি। এর কথাই তোমাকে বলেছি ভাবী।

'হ্যাঁ—' মেরির দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলিয়ে দিল সোমবারি।

কোথায় মেরির ওষুধ আছে, কখন-কখন কীভাবে তা খাওয়াতে হবে, সব জানিয়ে তিনটে টাকা সোমবারিকে দিতে-দিতে জোহন এবার বলল, 'ওর বোধহয় দুধ ফল-টল খাওয়া দরকার। কিনে দিও—'

'আচ্ছা—' সোমবারি দড়ির খাটিয়ায় মেরির পাশে গিয়ে বসল।

আর জোহন কাল রাত্তিরে ব্যান্ডপার্টির যে ড্রেসটা ধুয়ে শুকোতে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে পরে ফেলল। ঘুরে ফিরে ড্রেসটা দেখতে দেখতে লক্ষ্য করল রক্ত ধুয়ে ফেললেও এখানে-ওখানে ছ্যাকরা-ছ্যাকরা দাগ রয়ে গেছে। লনড্রিতে না দিলে ওই দাগ উঠবে না। তার মানে পুরো পাঁচটি টাকা গচ্চা যাবে।

পাঁচ টাকা খরচের কথা ভাবাভাবির সময় এখন নেই। চটপট ঘরে এসে চুলটা কোনওরকমে আঁচড়ে নিল জোহন। ফুলুটের বাক্সটা কাঁধে ফেলে সোমবারি আর মেরির দিকে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল।

গোয়ার মার্মাগাঁও পোর্টের কাছে এক ছোট শহরে জোহানদের বাড়ি। খুব ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে দেশ ছেড়ে বম্বে চলে এসেছিল সে। সেই থেকে এখানেই আছে। বম্বে আসার বছরখানেক আগে, জোহনের বয়স তখন পাঁচ কি ছয়, তার মা মারা গিয়েছিল। মায়ের মুখ এতদিনে তার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। দেশের কথাও জোহনের তেমন মনে পড়ে না। কখনও-সখনও এক-একা চুপচাপ বসে থাকলে তাদের সেই শহরে পোর্তুগিজ আমলের পুরোনো বাড়ি-ঘর, আঁকা-বাঁকা পাথুরে রাস্তা, নীল জলে-ভরা সমুদ্রের খাড়ি, আবছা-আবছা ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

বম্বে থেকে গোয়ার সেই ছোট্ট শহরটা মোট দুশো মাইল দূরে। ব্যালার্ড পিয়ের থেকে আজ দুপুরে জাহাজে উঠলে কাল দুপুরে পৌঁছনো যায়। কিন্তু বাবার সঙ্গে সেই যে বম্বে চলে এসেছিল, তারপর আর দেশে ফেরা হয়নি।

মনে আছে, বম্বে এসে এক রোড কনট্রাক্টরের কাছে মজুরের কাজ নিয়েছিল বাবা। সারাদিন বাবা রাস্তা তৈরি বা মেরামতের কাজ করত। আর জোহনকে একটু দূরে ছায়া-টায়া দেখে কোনও গাছের তলায় বা বাড়ির নীচে বসিয়ে রাখত। বিকেলবেলা কাজকর্মচুকিয়ে

মজুরি বুঝে নিয়ে জোহনের হাত ধরে কটন গ্রিনের ওদিকে এক ভাঙা-চোরা বাতিল গুদাম ঘরে চলে যেত। তখন ওখানেই তারা থাকত।

দু-তিন বছর এভাবে কাটবার পর দুম করে বাবা একদিন মরে গেল। তখন জোহনের বয়স কতই বা, খুব বেশি হলে দশ-এগারো। বাবা মরে যাবার পর কে তাকে দেখে, কে-ই বা খাওয়ায়। খিদের চোটে প্রথম-প্রথম দারুণ কষ্ট পেয়েছে জোহন। ভিক্ষে করার অভ্যাস নেই; লোকের কাছে হাত পাততে পারত না। ইরানিদের হোটেলে, নইলে উদ্দিপিদের লাঞ্চহেমের সামনে গিয়ে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। দয়া-টয়া হলে কেউ এক-আধটুকরো ছুঁড়ে দিত; কেউ দাঁত মুখ খিচিয়ে তাড়িয়ে দিত।

কিছুদিন পর জোহনের মনে হয়েছিল, এভাবে বাঁচা যাবে না। তার একটা ছোট মাউথ অর্গান ছিল। বাবা যখন পিচ গলিয়ে স্টোন চিপস মিশিয়ে রাস্তায় ঢালত, কিংবা মেরামতের জন্য গাইতি দিয়ে পুরোনো পিচের আস্তর তুলে ফেলত, তখন একাধারে বসে মাঝে-মাঝে আপন মনে মাউথ অর্গানটা বাজিয়ে যেত জোহন। বাবার মৃত্যুর পর বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল, নাকি নিজেরই মাথা থেকে ওটা বেরিয়েছিল, মনে নেই। জোহন মাউথ অর্গানে হিন্দি ছবির গান বাজিয়ে ফুটপাথে-ফুটপাথে ঘুরে বেড়াত। মোটামুটি ভালোই বাজাত সে। দোকানদার-টোকানদাররা তাকে ডেকে গণ্ডা-গণ্ডা মশলাদার হিন্দি ছবির গানের সুর শুনে পয়সা-টয়সা দিত। ফুটপাথে ঘুরতে-ঘুরতে পায়াধুনির কাছে এক ব্যান্ডপার্টির মালিকের নজরে পড়ে গিয়েছিল জোহন। সেই বাজনার দলটা-'শবনম ব্যান্ডপাটি' এবং তার মালিক মুর্তাজা সাহেব আর নেই। মুর্তজা সাহেব মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যান্ডপার্টি উঠে গেছে। তবে এই লোকটির কাছে জোহন আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।

মুর্তাজা সাহেবের কানটা ছিল দারুণ সজাগ। জোহনের মাউথ অর্গান শুনেই সে বুঝেছিল, ছোকরার দমে সুর আছে; তালিম দিলে ভালোই দাঁড়াবে। সে ডেকে বলেছিল, কার কাছে বাজাতে শিখেছিস?

জোহন বলেছিল, কারও কাছে না; নিজে নিজেই শিখেছি।

বহুত আচ্ছা! গান শুনলেই সুর তুলতে পারিস?

পারি।

'তোল দেখি—' বলে তখনকার দিনের একটা চটকদার ছবির গানের দু-কলি গেয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল মুর্তজা সাহেব।

দু-চারবার চেষ্টা করেই মাউই অর্গানে গানটা বাজিয়ে দিয়েছিল জোহন। মুর্তজা সাহেব দারুণ অবাক এবং খুশিও। জোহনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, শাবাশ বেটা, তুই দেখছি আসলি সোনা, পাক্কা চব্বিশ ক্যারেট।

তখনই খাবারের দোকান থেকে পেস্তা-কিসমিল লাগানো বম্বে হালুয়া, মোতিচুর। আর ছোলার ডালের লাড্ডু আনিয়ে খাইয়েছিল।

খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গল্পও চলছিল। জোহনের কে-কে আছে, কোথায় থাকে, ইত্যাদি শোনবার পর মুর্তাজা সাহেব আরও খুশি। বলেছিল, তোর আর কাটন গিরিনের (কন্টন গ্রিনের) গুদামে ফিরতে হবে না। আমার দলে তুই ভিড়ে যা।

জোহন জিগ্যেস করেছিল, আপনার দলে কী করতে হবে?

ফুলুট (ফ্লুট) বাজাবি। আমার একটা ফুলুটবালা দরকার।

আমি কি পারব?

জরুর পারবি। তোর খুনে সুর আছে; যা বাজবি তাতেই সুর বেরুবে। তা ছাড়া আমি তো আছি।

সুতরাং সেদিন সেই মুহূর্তে 'শবনম ব্যান্ডপার্টি'-তে ঢুকে গিয়েছিল জোহন। সেই যে একবার সে বাজনার দলে ঢুকাল তারপর আর বেরুনো গেল না। ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরে ষোলো-সতেরোটা দল ঘুরে এখন সে 'আনারকলি ব্যান্ডপাটি'-তে এসেছে। সব চাইতে বেশিদিন এখানেই তার কাটল। ছ-সাত বছর ধরে জোহান এই দলটায় আছে। দল উঠে না

গেলে, ব্যান্ডমাস্টার-কাম-প্রোপ্রাইটর ইফতিকার সাহেব কিংবা সে মরেটরে না গেলে এ-দলটা সে ছাড়ছে না।

পায়াধুনিতে 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র অফিসে জোহন যখন পৌঁছল, আটটা বেজে গেছে। ফাস্ট ট্রেন ধরে সাড়ে ছ'টার মধ্যে তার এখানে পৌঁছবার কথা ছিল। তার মানে পুরো দেড়টি ঘণ্টা লেট।

দলের আর সবাই, যারা সাইড ড্রাম, বিগ ড্রাম এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজায় তারা এসে গেছে। ব্যান্ডমাস্টার-কাম-প্রোপ্রাইটার ইফতিকার সাহেব ছটফট করছিল। আর ঘন-ঘন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কলপ মাখার জন্য চুল, জুলপি এবং খুঁচালো দাড়ি লালচে হয়ে গেছে। বেশ শৌখিন মানুষ। বাজাবার সময় ছাড়া চুস্ত আর লক্ষ্ণৌর কলিদার পাঞ্জাবি পরে। গা থেকে ভুর ভুর করে আতরের গন্ধ বেরোয়, চোখে সুর্মার সরু টান।

এমনিতে লোকটা চমৎকার-ভোলাভালা, বিরাট দিল তার। পয়সা নিয়ে দলের বাজনাদারদের সঙ্গে খ্যাচাখেচি করে না। তবে প্রচুর পরিমাণে ব্যাওড়া এবং ঠাররা (দুটোই দেশি চোলাই মদ) খেয়ে থাকে সে। চোখদুটো সর্বক্ষণ আরক্ত, মুখ থেকে ভক-ভক করে গন্ধ বেরুতে থাকে। নেশায় যাতে বেশিক্ষণ ইন্টারভ্যাল না পড়ে, সেজন্য সবসময় তার পকেটে একটা ঠাররার বোতল মজুত থাকে।

এ-লাইনের সবাই ড্রিংকটা করে থাকে। ইফতিকার সাহেবও করে। ওটা এমন কিছু ব্যাপারই না।

সে যাকগে, লোকটা এমনিতে ভালো ঠিকই, কিন্তু কাজকর্মের গাফিলতি করলে তার মাথার ঠিক থাকে না; তখন দারুণ খেপে যায়। ইফতিকার সাহেবের কথা হল, আগে কাম, পরে আরাম।

জোহনকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইফতিকার সাহেব। হাত-পা ছুঁড়ে সমানে চেঁচাতে লাগল। খই ফোটার মতো চড়বড় করে তার মুখ থেকে এক ঝলক খিস্তি বেরিয়ে এল।

জোহন চুপ করে রইল। এই খিস্তির সময়টা কেউ টুঁ শব্দটি করে না। বাধা দিলেই খিস্তির মাত্রা বেড়ে যাবে। তাতে অকারণ সময় নষ্ট। তা ছাড়া ব্যান্ডপার্টির সকলেই জানে, গালাগালটা সে মন থেকে দেয় না। মনটা তার ধবধবে সাদা।

তোড়ে একচেটি খিস্তি দিয়ে ইফতিকার সাহেব চুপ করল। হাওয়া বেরিয়ে গেলে বেলুনের অবস্থা যেরকম হয়, এখন তাকে অনেকটা সেইরকম দেখাচ্ছে। আসলে খিস্তির মুখে তার উত্তেজনা রাগ, সব বেরিয়ে গেছে। আর ওটা একবার বেরিয়ে গেলেই সে একেবারে মাটির মানুষ।

ইফতিকার সাহেব ব্যাওড়া-ঠাররা যে পরিমাণে সেবা করে থাকে, সেই পরিমাণেই পানজর্দা খায়। দু-তিন খিলি পান এবং এক খাবলা জর্দা একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে-চিকুতে নরম গলায় বলল, 'এখানে আয়—'

জোহন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল, ফাস টিরেন (ফাস্‌ট ট্রেন) ধরে তোর আসার কথা; এত দেরি করলি?

এক মিনিট আগে ক্ষিপ্তের মতো ইফতিকার সাহেবই যে খিস্তি করছিল, তার গলার স্বর শুনে এখন তা বুঝবার উপায় নেই।

জোহন বলল, কী করব, ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম যে—

কীসের ঝামেলা?

এত লোকের সামনে মেরির কথা বলা ঠিক হবে না। বললে, সবাই একসঙ্গে হামড়ে পড়বে। জোহন শুধু বলল, তোমাকে পরে বলব চাচা।

ইফতিকার সাহেব আর কিছু জিগ্যেস করল না। নিজের থেকে না বললে খুঁচিয়ে কিছুই সে জানতে চায় না। অকারণ কৌতুহল তার নেই। সে বলল, ঝামেলায় পড়েছিস,

আগে বলিসিনি কেন?

তুমি বলতে দিলে কোথায়? আমাকে দেখেই তো খিস্তি ঝাড়তে শুরু করলে।

পাশ থেকে খড়কে তুলে নিয়ে দাঁত খুঁটিতে-খুঁটতে সরল নিষ্পাপ শিশুর মতো হাসল ইফতিকার সাহেব। বলল, 'তা বটে, তা বটে—' বলতে-বলতেই তার চোখের দৃষ্টি আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কর্কশ গলায় সে বলল, অ্যাই হারামি, ড্রেসে এগুলো কী লাগিয়েছিস? কীসের দাগ ওগুলো?

চমকে জোহন লক্ষ্য করল, আঙুল বাড়িয়ে তার ড্রেসে রক্তের ছ্যাকরা-ছ্যাকরা দাগগুলো দেখাচ্ছে ইফতিকার সাহেব। জোহন উত্তর দেবার আগেই আরেকবার লাফিয়ে উঠল সে। হাতপা ছুড়ে খানিক আগের মতো তোড়ে গালাগাল দিয়ে যেতে লাগল, দেড়শো টাকা দিয়ে কাল নয়া ড্রেস বানিয়ে দিয়েছি, আজই হারামি বরবাদ করে দিলি! এ শালে কুত্তা, এ উল্লুকা পাঠ্ঠে—

ব্যান্ডপার্টির ড্রেস মালিকরাই দিয়ে থাকে। অন্য দলের প্রোপ্রাইটাররা এ-বাবাদে কিছু কিছু ভাড়া নিয়ে থাকে। ইফতিকার সাহেব কিন্তু সিকি পয়সাও নেয় না। যাই হোক চুপচাপ ইফতিকার সাহেবের নতুন খিস্তিগুলো শুনে যেতে লাগল জোহন।

কিছুক্ষণ বাদে উত্তেজনা কেটে গেলে ইফতিকার সাহেব আর-এক দফা পান-জর্দা মুখে পুরল। চিবুতে-চিবুতে কোমল গলায় বলল, দাগগুলো তো ইচ্ছে করে লাগাসনি নিশ্চয় কিছু হয়েছিল, তাই না রে?

হ্যাঁ।

ইচ্ছে করে যে লাগাসনি, এ-কথাটা আগে বলিসনি কেন?

তুমি কি আগে কারওকে কিছু বলতে দাও চাচা?

জোহনের পিঠে চাপড় মারতে-মারতে শব্দ করে হেসে উঠল। ইফতিকার সাহেব, ঠিক বলেছিস।

জোহন চুপ করে রইল।

ইফাতিকার সাহেব। এবার বললেন, দাগটা কী করে লাগল, বল—

পরে শুনো।

আচ্ছা। এখন তাহলে রিহার্সাল দিতে চল—

ব্যান্ডপাটির অফিসটার ঠিক পেছনেই অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া একটা চালা আছে; চারদিক অবশ্য খোলা। এটাই 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র রিহার্সাল রুম। সবাইকে নিয়ে ইফতিকার সাহেব সেখানে চলে এল। বাজনাদারদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে বলল, আসছে হপ্তায় কর্পোরেশনের যে ভোট হয়েছে, তার রিজাল (রেজাল্ট) বেরুবে।' তারপর একটা রাজনৈতিক দলের নাম করে বলল, 'ওই পার্টির পার্টির সাহেব আমাদের ব্যান্ডপার্টি বায়না করে গেছে। রিজালের দিন উনি জিতলে জুলুস বেরুবে। জুলুসের আগে-আগে আমাদের বাজিয়ে যেতে হবে। এখন একটা কথা—

পাটিল সাহেব অর্থাৎ মাধবরাও পাটিলকে জোহনরা ভালো করেই চেনে। এর আগেও ওঁর পার্টির নানা বিজয়োৎসবে 'আনারকলি ব্যান্ডপাটি' বাজিয়ে এসেছে। সমস্বরে সবাই বলে উঠল, কী কথা?

পুরোনো যেসব গান আছে ওতে চলবে না। নয়া মশলাদার ফিল্মি গানের সুর বাজাতে হবে।

কোঈ বাত নেহী। নয়া গানার সুরই বাজাব। কী বাজাতে হবে বলো।

পকেট থেকে একগাদা হিন্দি ছবির বুকলেট বার করে। ইফতিকার সাহেব তিনটে গান পড়ল — 'প্রেমনগর হ্যায় আপনা', 'ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি।' এবং হাম তুমি এক কামরেমে বন্ধ হো'— পড়া হয়ে গেলে বাজনাদারদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই গান ক'টা আমি পসন্দ করেছি; তোরা কী বলসি?

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ফাস কিলাস (ফাস্ট ক্লাস)।

ইফতিকার সাহেব দারুণ খুশি। কেন না তার নির্বাচিত গানগুলো সবারই ভালো লেগেছে। সে বলল, তোরা একটু দাঁড়া, আমি দু-মিনিটের মধ্যে আসছি।

কিছুক্ষণ বাদে ব্যাটারি-দেওয়া একটা রেকর্ডপ্লেয়ার আর রেকর্ড নিয়ে এল ইফতিকার সাহেব। প্লেয়ারটা চালিয়ে 'ঝুম বরাবর' গানটা প্রথমে কয়েকবার শুনিয়ে দিল। তারপর সবার কানে যখন গানটা বসে গেছে তখন বলল, 'সুরটা তুলে ফেল—' বলেই একটা বিগ ড্রাম বুকের কাছে ঝুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, 'রেডি, ওয়ান টু থ্রি—'

কর্নেটওলা, ক্লারিওনেটওলা, ড্রাম-ব্রাসওলারা আস্তে-আস্তে যে-যার বাদ্যযন্ত্রে সুরটা বাজাতে লাগল। পুরো গানটা তুলতে দুপুর গড়িয়ে গেল। সিজনের সময় অর্থাৎ বিয়ে কিংবা উৎসবের মরশুমে যেদিন-যেদিন কোথাও বাজাবার অর্ডার থাকে না, সেই দিনগুলো ইফতিকার সাহেব দলের লোকদের নিয়ে নতুন গানের রিহার্সাল দেয়। এজন্য সবাইকে পুরো দিনের মজুরি দিয়ে থাকে সে।

আজ কোথাও বাজাবার বায়না নেই; তাই নতুন গানের রিহার্সাল দিচ্ছে ইফতিকার সাহেব। একটা গান তুলবার পর সে বলল, 'দুপুর হয়ে গেছে, যা তোরা খেয়ে-টেয়ে আয়। দুটোর সময় আবার রিহার্সাল শুরু করব। আজকের মধ্যে বাকি গান দুটো তুলে ফেলতেই হবে। কাল থেকে একটানা পনেরো দিন রোজ বায়না আছে। সুরগুলো তুলে না নিলে আসছে হপ্তায় ভোটের রিজালের দিন নতুন গান বাজানো যাবে না।'

বাজনাদারেরা নিজের পছন্দমতো হোটেলে খেতে চলে গেল। যোহন গেল উদিপিদের লাঞ্চ হোমে; ওখানে সস্তায় পেট ভরে খেতে পাওয়া যায়। তবে সব খাবারই ওখানে নিরামিষ; উদিপিদের হোটেলে মাছ-মাংসের কারবার নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর কাঁটায়-কাঁটায় দুটোয় রিহার্সাল শুরু হল। বাকি গানদুটো তুলতে সন্ধে হয়ে গেল।

গান-টান তোলা হলে বাজনাদারেরা যে যার মজুরি নিয়ে নিল। ব্যান্ডপার্টিতে সবাই এক মজুরি পায় না। বাদ্যযন্ত্রের গুরুত্ব অনুযায়ী কম-বেশি পেয়ে থাকে। যারা ক্ল্যারিওনেট বা ফ্লুট বাজায়, তারা ড্রামওলাদের চাইতে বেশি মজুরি পায়। সেদিক থেকে জোহন দলের সবচেয়ে দামি আর্টিস্টদের একজন।

মজুরি নিয়ে একে-একে অন্য বাজনাদারেরা চলে গেল। জোহন কিন্তু গেল না। সে মজুরিও নেয়নি। ইফতিকার সাহেব বলল, তোর টাকাটা নে। অফিস বন্ধ করে আমাকে বেরুতে হবে।

তাকে বেশ চনমান করতে দেখা গেল। জোহন ইফতিকার সাহেবের এই চনমনে ভাবটার কারণ জানে। লোকটা বিয়ে টিয়ে করেনি, তাই বলে ঝাড়া হাত-পা ফকির-টকির নয়। কোলাবার ওদিকে তার বাঁধা একটি মেয়েমানুষ আছে। যেদিন কোথাও বাজাবার বায়না থাকে না, সেদিন আরব সাগরে সূর্য ডুবতে-না-ডুবতেই ইফতিকার সাহেব কানে আতর দিয়ে, লক্ষ্ণৌয়ের কলিদার পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে, চোখে সূর্মাটি টেনে, ছুঁচালো দাড়ি আর গোঁফ চুমরোতে-চুমরোতে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসে; তারপর সিধে কোলাবা। একটা সেকেন্ডও তখন তাকে আটকে রাখা যায় না।

জোহন বলল, বাহ, এখন যাবে কী, আমার ঝামেলার কথা শুনবে না?

এবার মনে পড়ে গেল। ইফতিকার সাহেবের। বলল, হাঁ-হাঁ বল, তবে একটু তাড়াতাড়ি করিস। দেরি করে গেলে আওরতটা আবার হুজ্জুত করে।

ইফতিকারের মেয়েমানুষের কথা সবাই জানে। নিজেই রাসিয়ে-রাসিয়ে সকলকে সে বলেছে। এ-বিষয়ে তার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই।

জোহন মেরির ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে বলল, এবার বুঝলে তো, সকালে আসতে কেন দেরি হয়েছিল। আর ড্রেসে কেন দাগ লেগেছিল।

দেরি হওয়া বা ড্রেসে দাগ লাগা, এ-সব কানে যায়নি ইফতিকার সাহেবের। মেরির নাম শুনেই তার চোখ গোলাকার হয়ে গিয়েছিল। এক গাদা পান জর্দা মুখ ছুড়ে দিয়ে

চিবুতে-চিবুতে বলল, 'যাক অ্যাদিনে তোর একটা হিল্লে হল। শাদি করলি না, বাঁধা আওরত রাখলি না। ঠাররা গিলে আর ফুলুট মুখে পুরে জিন্দেগি বরবাদ করে দিলি। যেভাবেই হোক তোর ঝোপড়িতে একটা মেয়েমানুষ ঢুকে পড়েছে। আমার কী ইচ্ছে করছে জানিস?

সন্দিগ্ধ চোখে ইফতিকার সাহেবের দিকে তাকালো জোহন। বলল, কী?

নাঙ্গা হয়ে পুরা বাড়ী বন্দর, মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলস আর ওরলি ঘুরে আসি।

যাঃ, তোমাকে নিয়ে শালা পারা যায় না।

ইফতিকার সাহেব হাত নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল, লড়কি একবার যখন ঢুকে পড়েছে আর বেরুতে দিস না। শাদি ফাদি করে যদি আটকে ফেলতে পারিস, বিশ টাকার জায়গায় পাঁচিশ টাকা মজুরি করে দেব।

কাঁধ এবং হাত বাঁকিয়ে হতাশভাবে জোহন বলল, সব কথায় তোমার খালি মাজাক।

ঠিক আছে ঠিক আছে, এখন আমাকে ছেড়ে দে। তোর মেরি ভালো হয়ে উঠলে ভেবেচিন্তে কিছু একটা করা যাবে। এক্ষুনি আমার না বেরুলেই নয়। আওরতটা চটে গেলে দরজা খুলবে না। তামাম রাত বাইরে বসে থাকা এই বুড্‌ঢা বয়েসে পোষায়? এই নে তোর মজুরি—' বলে কুড়িটা টাকা বাড়িয়ে দিল সে।

জোহন টাকাটা নিতে-নিতে দ্রুত একবার ভেবে নিল। কাল মজুরির যে বিশ টাকা পেয়েছিল, তার সবটাই খরচ হয়ে গেছে। হাতে একটা পয়সাও আর নেই। আজকের মজুরির টাকাটা অবশ্য আছে। কিন্তু মেরির জন্য ওষুধ, ইঞ্জেকশান এবং ফল-টলের খরচা রয়েছে। কুড়িটা টাকা নিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে ঘরে এনে ঢুকিয়েছে, কতদিন ভোগাবে কে জানে। যতদিনই ভোগাক, এখন আর বার করে দেওয়া যাবে না। কী ঝঞ্ঝাটেই যে পড়া গেছে! জোহন ভেবে দেখল, কিছু বাড়তি টাকা হাতে থাকা ভালো। মেরির জন্যে কখন কী দরকার হবে কে জানে।

নিজের জন্য কখনও ভাবে না জোহন। তার জমানো একটা পয়সাও নেই। কাল কী খাবে, কীভাবে চলবে, এসব নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। মোটামুটি আজকের দিনটা চলে গেলেই হল। কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে। আসলে সে নিজের সম্বন্ধে খুবই উদাসীন। অথচ ব্যান্ডপার্টিতে ফুলুট বা ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে কম পয়সা কামায় না সে। রোজ এক বোতল ঠাররা আর দু-বেলা উদিপি কি সিন্ধিদের হোটেলে খেতে কত আর লাগে। বাকি পয়সা সে লোককে দিয়ে দেয়। ঝোপড়াপট্টির বাসিন্দা বা ব্যান্ডপার্টির বাজিয়েরা কতবার তার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছে, জোহনের খেয়াল নেই। হাত পাতলেই হল, পকেটে পয়সা থাকলে সে কারওকে ফেরায় না। আর কেউ একবার নিলে ফেরত দেবার নাম নেই। অবশ্য ফেরত পাবার আশা কখনও করে না জোহন।

আজ কিন্তু মেরির কথা ভেবে, টাকার চিন্তা করতে হল জোহনকে। সে বলল, চাচা একটা কথা বলছিলামহো

ক্যাশবাক্সে আর বাদ্যযন্ত্রের আলমারিতে তালা লাগাতে-লাগাতে ইফতিকার সাহেব বলল, বলে ফেল।

আমাকে পঞ্চাশটা টাকা অ্যাডভান্স দাও। পাঁচ টাকা করে রোজ মজুরি থেকে কেটে নিও।

কুড়ি-বাইশ বছর 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-তে বাজিয়ে যাচ্ছে জোহন। আগাম টাকা কখনও সে চায়নি। ঘাড় ফিরিয়ে একটু অবাক হয়েই ইফতিকার সাহেব বলল, অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে কী হবে?

কারণটা বলল জোহন।

আবার ক্যাশবাক্স খুলে পঞ্চাশটা টাকা জোহনকে দিতে-দিতে ইফতিকার সাহেব মুখ মুচকে হাসল। চাপা গলায় বলল, দরদ! শালা বিলকুল খতম হয়ে গেছিস। ও লড়কি পুরা জিন্দগি তোর কাঁধেই চেপে থাকবে। কথাটা বলে রাখলাম, মনে করে রাখিস।

জোহন বলল, ‘এরকম বলে-বলে তুমিই আমাকে খতম করবে।’ বলে আর দাঁড়াল না।

ব্যান্ডপার্টির অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে ক্রফোর্ড মার্কেটের পেছনে চলে গেল জোহন। সেখানে পাকস্থলী বোঝাই করে ঠাররা খেয়ে মার্কেট থেকে মেরির জন্য আঙুর, মুসম্বি আর চিকু কিনল। তারপর ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে গিয়ে হারবার লাইনের ট্রেনে উঠে বসল।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন সে ডান্ড কোস্টের ঝোপড়াপট্টিতে তার ঘরটিতে পৌঁছল তখন রাত নটা বেজে গেছে। ঠাররার নেশাটা রক্তের ভেতর ঝুমঝুম করছিল, পা অল্পস্বল্প টলছিল; তবে মাথাটা পরিষ্কার আছে। এক বোতল ঠাররা তার কাণ্ডজ্ঞান ঝাপসা করে দিতে পারেনি।

ঝোপড়িতে আলো জ্বলছিল। মেরি দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে; সোমবারি একটা আধভাঙা টুলের ওপর বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। জোহন ঢুকতেই সোমবারি উঠে পড়ল। বলল, এই যে ফুলুটবালা, সন্ধেবেলা ফেরার কথা, এত দেরি করলে?

ফলের ঠোঙাগুলো একাধারে নামিয়ে রেখে জোহন বলল, রিহার্সাল ছিল, অনেগুলো গান তুলতে হয়েছে, তাই দেরি হয়ে গেল।

ঠিক আছে। সারাদিন তোমার জিনিস পাহারা দিয়েছি, নিজের মাল বুঝে নাও।

মেরিকে দেখিয়ে-দেখিয়ে কথাটা বলল সোমবারি। জোহন হাসল। সোমবারি এবার বলল, একটু আগে ডাক্তারসাব এসে সুঁই (ইঞ্জিকশন) দিয়ে গেছে। আর তুমি যে টাকা দিয়ে গিয়েছিলে, তার থেকে পাও, দুধ আর সাস্তারা কিনে মেরিকে খাইয়েছি। দুটাকা আশি পয়সা খরচা হয়েছে। বিশ পয়সা রয়েছে, এই নাও। এবার আমাকে যেতে হবে।’ কুড়িটা পয়সা জোহনের হাতে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সোমবারি।

জোহন বলল, এখনই যাবে?

সেই সকাল থেকে তোমার ঝোপড়িতে বসে আছি। আমার ঘর-সংসার নেই! সেই লোকটা ঘোড়ার জুয়া খেলে এসে এখন নিশ্চয়ই লাফাচ্ছে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

চোখ মটকে হাসল সোমবারি। অশ্লীল একটা ছড়া কেটে চাপা গলায় বলল, তুমি এসে গেছ। এখন আমি থাকলে তোমার ভালো লাগবে না। ফুলুটবালা ফাঁকা ঘরে দুজনে এবার টমটম চালিয়ে যাও।’

জোহন বলল, মাজাক করছ।

ডাইনে-বাঁয়ে জোরে-জোরে মাথা নাড়ল সোমবারি। চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে হাসতে লাগল, মাজাক না, সচ্ বলছি!

কথা বলতে-বলতে ওরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। জোহন এবার জিগ্যেস করল, মেয়েটাকে কেমন দেখলে ভাবী?

একেবারে আনারের দানা। বহুত ভারী জখম হয়ে আছে। দেখ ফুলুটবালা, আজ রাত্তিরেই ওকে আবার খেয়ে ফেল না।

ফির মাজাক?

সোমবারি হাসতে লাগল।

জোহন বলল, মেয়েটার কথা কিছু জানতে পারলে?

সোমবারি জিজ্ঞাসু চোখে তাকল, কী কথা?

এই কোথায় থাকে, কী করে এখানে এল, ওই লোকগুলো ছুরি মেরেছে। কেন—এই সব?

করেছিলাম।

দারুণ আগ্রহের সঙ্গে জোহন জিগ্যেস করল, কী বললে?

সোমবারি বলল, কিছু না। আমাকে বোধহয় বলতে চায় না। তুমিই ওগুলো জেনে নিও।

একটু চুপ করে থেকে জোহন বলল, সারাদিন একসঙ্গে রইলো। মুখ বুজে তো আর থাকোনি। কী কথা হল তবে?

স্রিফ তোমার কথা। তুমি ওর জান বাঁচিয়েছ, এই কথাটা হাজার বার বলেছে মেরি। আচ্ছা! যাই— ঝোপড়পট্টির আঁকাবাঁকা গলির ভেতর দিয়ে সোমবারি চলে গেল।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জোহন। তারপর ঘরে ফিরে আসতেই মেরির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। এখন মেয়েটাকে বেশ ভালো দেখাচ্ছে। রক্তপাতজনিত চোখমুখের সেই অসুস্থ ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। জোহন জিগ্যেস করল, এখন কেমন লাগছে?

মেরি বলল, ভালো।

ওষুধগুলো সময়মতো খেয়েছিলে তো?

হ্যাঁ।

'ভাবী তোমাকে রাত্তিরের খাবার খাইয়ে দিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

মেরির খাওয়ার কথায় জোহনের মনে পড়ল, তার নিজেরই খাওয়া হয়নি এ-বেলা। অন্য দিন হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেরে সে।

যাক গে, পাউরুটি টুটি কিনে নিয়ে এসেছে। একটা রাত ওতেই চলে যাবে। মেরিকে আপাতত আর কিছু না বলে পায়জামা আর গেঞ্জি নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেল জোহন। ব্যান্ডপার্টির ড্রেসটা বদলে একটু বাদে আবার ঘরে এসে ঢুকল। ড্রেসটা কোণের দড়িতে ঝুলিয়ে মেরির কাছাকাছি সেই আধভাঙা টুলটায় গিয়ে বসল।

সকালেও এই প্রশ্নটা করেছিল সে। জোহন তখন উত্তরটা দেয়নি, এবার দিল। কীভাবে কোন অবস্থায় রাস্তা থেকে মেরিকে তুলে এনেছিল, সব জানালো।

মেরি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর গাঢ় কৃতজ্ঞ সুরে বলল, রাস্তা থেকে তুমি তুলে না আনলে মরে যেতাম।

জোহন লক্ষ্য করল, মেয়েটা তাকে 'তুমি' করে বলছে। সে ব্যান্ডপার্টিতে ফ্লুট বাজায়। সে শরাবি এবং ঝোপড়াপট্টিতে থাকে, খুব সম্ভব তাকে এর বেশি মর্যাদা দেবার কথা ভাবছে না মেরি। জোহন কিছু বলল না।

মেরি আবার বলল, না আনলেই ভালো করতে। মরতে পারলে বেঁচে যেতাম।

জোহন বলল, কেন?

মেরি উত্তর দিল না।

একটু ভেবে জোহন জিগ্যেস করল, ওই লোক দুটো কারা?

মেরি বুঝতে পারল যারা তাকে ছুরি মেরেছে, তাদের কথা জানতে চাইছে জোহন। সে বলল, ওরা বদমাশ, ডাকু, গুন্ডা, ফরেবি—

এক নিশ্বাসে এতগুলো শব্দ উচ্চারণ করে উত্তেজনায় সে হাঁপাতে লাগল। মাথার ভেতর ঠাররার নেশাটা ফিকে হয়ে আসছিল জোহনের। সে একটু অবাক হয়ে বলল, ওরা তোমায় পেল কি করে?

মেরি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল না, চোখ দুটো অন্যদিকে ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল। জোহন আবার বলল, কী হল, বললে না?

মেরি মুখ ফেরাল না। একইভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে-মনে উত্তরটা ঠিক করে নিল হয়তো। তারপর বলল, 'তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তোমার কাছে লুকোব না, আমি খারাপ মেয়ে।'

হতভাম্বের মতো মেরিকে দেখতে-দেখতে জোহন বলল, খারাপ মেয়ে! মানে?

একটু চুপ করে থেকে মেরি বলল, পেটের জন্যে আমাকে নোংরা রাস্তায় নামতে হয়েছে।

এবার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। এই বোম্বাই শহরে হাজার-হাজার মেয়ে পেটের জন্য শরীর বেচে বেড়াচ্ছে, জোহন সে খবর রাখে। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, নরম্যান পয়েন্ট কি জুহুতে দশ গজ হাঁটলেই পাঁচটা করে এরকম মেয়ে চোখে পড়বে। সাজসজ্জা, চাউনি ইত্যাদি দেখেই তাদের আসল পরিচয়টা টের পাওয়া যায়। কিন্তু জোহনের একটা কথা ভেবে অদ্ভুত লাগছিল, যে-মেয়েরা শরীর বেচে খায়, তাদের কেউ মেরির মতো এভাবে নিজের নোংরা গ্লানিকর পেশার কথা বলে না। সেদিক থেকে মেয়েটা খুবই অকপট, কিংবা হয়তো নির্বিকার আর বেপরোয়াও। এমন সরল স্বীকারোক্তি শোনবার পর কী বলা উচিত, জোহন ভেবে পেল না।

মেরি বলতে লাগল, ওই বদমাশ দুটো কথাবার্তা ঠিক করে আমাকে ডান্ডার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন কী জানতাম ওদের মতলব অন্যরকম। সমুদ্রের দিকে আসতে-আসতে অন্ধকার রাস্তায় আমার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, টাকা পয়সা আর একটু-আধটু গয়না যা গায়ে ছিল কেড়েকুড়ে নিতে লাগল। আমি দিতে চাইনি, হাত-পা ছুড়ে চেঁচিয়ে ওদের ঠেকাতে চেয়েছিলাম। ওরা তখন সোজা ছুরি চালিয়ে দিল।

কোনও ব্যাপারেই তেমন আকর্ষণ নেই জোহনের, দারুণ উদাসীন আর নিস্পৃহ টাইপের মানুষ সে। পৃথিবীর বাইরের স্তরে আলতোভাবে ভেসে থাকে। কোনও কিছুতেই অভিভূত হয়ে পড়ে না।

ঠাররার নেশাটা ক্রমশ আরও ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল এমন পবিত্র-নিষ্পাপ চেহারার মেয়েটা বেশ্যা না হলেই ভালো হতো। বুকের ভেতর আবছাভাবে একটু কষ্ট অনুভব করতে লাগল জোহন।

কথা বলতে-বলতে জোহনের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গিয়েছিল মেরি। একদৃষ্টি কিছুক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ সে বলে উঠল, কী ভাবছ?

জোহন দূরমনস্কর মতো বলল, কিছু না তো।

'খুব ঘেন্না হচ্ছে?' মেরির গলা এবার চাপা এবং গভীর।

জোহন প্রায় চমকে উঠল, ঘেন্না হবে কেন?

একটা নোংরা খারাপ মেয়ে ঘরে এনে তুলেছ বলে।

এসব তুমি কী যা-তা বলছ।

মেরি হাসল। একটু পরে কাল, একটা সত্যি কথা বলবে?

আমি বাজে মেয়ে, এটা আগে জানলে নিশ্চয়ই রাস্তা থেকে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিতে না।

জেহন বলল, তোমার এ-কথাটা ভেবে দেখিনি। যে-ই হোক, রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে তুলে নিয়ে আসতাম।

মেরি উত্তর দিল না, পলকহীন স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

জোহনের হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে বলল, সকালবেলা তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।

কী?

তুমি যে জখম হয়ে আমার এখানে আছ, এ-খবরটা কারওকে দিতে হবে?

কাকে দেবো?

জোহান একটু ভেবে বলল, এই ধরে তোমার বাবা-মাকে।

মেরি বলল, আমার বাপ-মা নেই।

তবে আর কেউ-ভাই, বোন, দাদা, মাসি।

আমার কেউ নেই।

একটু চুপ। তারপর জোহন জানতে চাইল, তুমি কোথায় থাকো?

মেরি পাশ ফিরে তাকাল, কেন?

সেখানে নিশ্চয়ই তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে।

জোহনকে বেশ চিন্তান্বিত দেখাল।

মেরির মুখে বিষণ্ণ ছায়ার মতো কিছু একটা পড়ল যেন। পরক্ষণে তীক্ষ্ণ, রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠল সে।

জোহন বলল, হাসছ যে?

তোমার কথা শুনে। মেয়েমানুষের মাংস না কামড়ালে যাদের চলে না-তেমন কতকগুলো শরাবি, লুচ্চা ছাড়া কেউ আমার খোঁজ করে না। আমার কথা যারা সত্যি-সত্যি ভাবত, তারা কেউ বেঁচে নেই।

বিমূঢ়ের মতো বসে রইল জোহন, তার গলার ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল শুধু।

কী ভেবে মেরি এবার বলল, আমার থাকার কিছু ঠিক নেই। রাত্তিরে যে আমাকে ধরে নিয়ে যায়, তার কাছেই থাকি। দিনটা নিয়েই যত ভাবনা। হাতে কিছু পয়সা জমলে কেরানি ছুকরিদের যে হোস্টেল আছে। সেখানে চলে যাই। নইলে সস্তার কোনও হোটেলে। এখন আছি কিং সার্কেল স্টেশনের পাশের ঝোপড়পট্টিতে। সেখানে আর না ফিরলেও কেউ চিন্তা করবে না।

সুতরাং এ-ব্যাপারে আর কিছু বলার বা জিগ্যেস করার মানে হয় না। বড় একটা হাই তুলে হাতের ভর দিয়ে উঠতে-উঠতে জোহন বলল, দারুণ খিদে আর ঘুম পেয়েছে। তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে, আমি একটু খেয়ে নিই।

মেরি বিব্রতভাবে বলল, হাঁ-হাঁ নিশ্চয়ই। দেখ দিকি, এতক্ষণ ধরে আমি বকবক করে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে জোহন পাও আর চিনি দিয়ে দ্রুত রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলল। তারপর একটা হাওয়া-বালিশ আর নোংরা চিটচিটে বিছানার চাদর নিয়ে দরজার দিকে গেল।

মেরি ব্যস্তভাবে বলল, এ কী, কোথায় যাচ্ছ?”

বাইরের বারান্দায়।

কেন?

ওখানে শোব।

বাইরে শোবে কেন?

এই মানে—

চট্ করে মানেটা বুঝে নিয়ে মেরি বলল, ও, আমি আছি বলে—

জড়ানো গলায় আবছাভাবে কী বলল জোহন, বোঝা গেল না।

মেরি এবার বলল, তুমি তো আমাকে ভারী বিপদে ফেললে।

জেহন বলল, কোন?

তুমি ঘরবালা হয়ে বাইরে শোবে, আর আমি কোত্থেকে উড়ে এসে তোমার ঘরে জুড়ে বসলাম। আমার মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়।

আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কিন্তু বাইরে না গিয়ে ঘরেও তো শুতে পার। এখানে জায়গার অভাব নেই।

দশ মাইল দূরে তো আর যাচ্ছি না। দরজার বাইরেই থাকছি। ঘরে শোওয়াও যা, বারান্দায় শোওয়াও তাই।

তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল জোহন। তারপর বিছানার চাদরটা পেতে হাওয়া-বালিশে ফু দিয়ে-দিয়ে বাতাস পুরে পরিপটি একটি বিছানা বানিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে চোখের পাতাদুটো আঠার মতো জুড়ে আসতে লাগল।

ঘুমটা তখনও ভালো করে সারা শরীরে ভর করেনি; আচমকা ঘরের ভেতর থেকে মেরির গলা শোনা গেল, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

জড়ানো গলায় জোহন বলল, না।

আমার খুব খারাপ লাগছে। তুমি কিন্তু ঘরেই শুতে পারতে।

এ-ব্যাপারটা নিয়ে আর ভেবো না। অনেক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ো।

উত্তর না দিয়ে মেরি বলল, বুঝেছি।

জোহন জানতে চাইল, কী?

তুমি খুব ভীতু, তা না হলে সাধু মহাত্মা।

আমি কোনওটাই না। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ-কথাটা মনে হল?

ভীতু কিংবা সাধু-টাধু না হলে ঘরেই শুতে।

জোহন উত্তর দিল না।

মেরি আবার বলল, তোমাকে বেশি কষ্ট দেব না; একটু হাঁটতে পারলেই আমি চলে যাব।

একটু পরে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে উঠেই স্নান-টান সেরে ব্যান্ডপার্টির ড্রেস গায়ে চাপিয়ে জোহন কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে চা বানাল। সেই চা এবং কালকের বাসি পাও নিজে খেল, মেরিকে খাওয়াল। তারপর মেরিকে একটা ট্যাবলেট দিল। এক ঢোক জল মুখে পুরে ঢাক করে ট্যাবলেটটা গিলে ফেলল মেরি।

আজ মেরিকে অনেক তাজা দেখাচ্ছে, কালকের তুলনায় সে অনেক বেশি সুস্থ। জোহন বলল, আমাকে এবার বেরুতে হবে। কাল তোমাকে বলেছি। আমি ব্যান্ডপার্টিতে ফ্লুট বাজাই। মনে আছে?

মেরি মাথা নাড়ল, আছে।

আজ আমাদের ব্যান্ডপার্টি ইগতপুরী যাবে। ওখানে এক কারখানার সিলভার জুবিলি ফাংশান হবে; আমাদের বাজাতে হবে। আমার ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

আচ্ছা।

তুমি তো আজ ভালোই আছ। তোমার কাছে লোক থাকার দরকার আছে?

না।

ঘরে পাও আছে, সান্তারা আছে, আঙুর-আনার আছে-খেয়ে নিও। ভাবীকে বলে যাব, মাঝে-মাঝে এসে তোমার খোঁজ নিয়ে যাবে।

আচ্ছা।

জোহন বেরুতে যাবে, ঝোপড়াপট্টির একগাদা মেয়েমানুষ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে হাজির। মেরির খবরটা এর মধ্যে নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে। এমনিতে এখানে কেউ কারও ব্যাপারে মাথা ঘামায় না, তবু কৌতুহল বলে বস্তুটা তো সবারই আছে। তাদের আসাটা সেই জন্যই।

পাতলা ছিপছিপে চেহারার একটা মেয়েমানুষ, এখানকার এক মাদারি খেলোয়াড়ের আওরত সে-সবার প্রতিনিধি হয়ে বলল, তোমার ঘরে নাকি একটা লড়কি এসে ঢুকেছে ফ্লুটবালা?

জোহন বলল, গন্দ পেয়ে গেছ?

জরুর।

ভিড়ের ভেতর থেকে সিড়িঙ্গে চেহারার একটি বউ চোখ ঘুরিয়ে বলল, আগ (আগুন) আর কতক্ষণ চাপা দিয়ে রাখবে!

জোহন হাসল, ভেতরে এসো, আলাপ-টালাপ করে যাও।

মেয়েমানুষগুলো হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে ঝুলতেঝুলতে বাচ্চাগুলোও এল।

এই ঝোপড়াপট্টিতে কে কার ঘরে এল, কে কাকে নিয়ে থাকছে, কে কাকে নিয়ে শুচ্ছে, এসব ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামায় না। এখানে যে যার নিজেকে নিয়েই অনবরত

চরকিকলে ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু ফুলুটবালা জোহনের কথা আলাদা। সবার সঙ্গে তার খাতির, সবাই তাকে পছন্দ করে, বিপদে পড়লে অনেকেই তার কাছে হাত পাতে। সুতরাং তার সম্বন্ধে কারওই মুখ ফিরিয়ে উদাসীন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। বিশ-পঁচিশ বছর যে লোকটা এক-একা ঝোপড়াপট্টিতে পড়ে আছে, দুম করে তার ঘরে একটি যুবতী মেয়ে এসে হাজির হলে কৌতুহল হবারই কথা। ঝোপড়াপট্টির মেয়েমানুষগুলো তাই ছুটে এসেছে।

জোহন সবার সঙ্গে মেরির আলাপ করিয়ে দিল। এই মেয়েমানুষগুলো কেউ মাদারি খেলোয়াড়ের বউ, কারও ঘরবালা দেওয়ালে-দেওয়ালে সিনেমার পোস্টার সেঁটে বেড়ায়, কারও ঘরবালা সাইনবোর্ড আঁকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাইনবোর্ড আঁকিয়ের বউ আচমকা প্রশ্ন করল, মেরি তোমার কে হয়?

মেরিকে কোথায় কীভাবে পেয়েছে, সে সব গিল্ডার আর সোমবারিদের কাছে বলেছে জোহন। অবশ্য মেরি যে বেশ্যা, গায়ের মাংস বেচে তার পেট চালাতে হয়, এটা আর বলেনি। বলার সুযোগ হয়নি। কেন না কাল রাতেই মেরির আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছে সে; তারপর সোমবারিদের সঙ্গে আর দেখাটেখা হয়নি। অবশ্য দেখা হলেও এ-ব্যাপারটা আপাতত গোপনই রাখবে সে। মেরিকে কী অবস্থায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে এবং সে যে তার সম্পূর্ণ অচেনা, গিল্ডারদের একথা জানিয়েছে জোহন। তার বিশ্বাস গিল্ডাররা ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে এ-খবর চাউর করে বেড়াবে না। কিন্তু মেরি সম্বন্ধে আসল কথাটা এই মেয়েমানুষগুলোকে বলতে জোহনের আটকাল। সাইনবোর্ড আঁকিয়ের বউর প্রশ্নের জবাবে সে বলল, ও আমার রিস্তাদার (আত্মীয়) হয়।

ডাক্তার গিল্ডার এই উত্তরটাই তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল।

বউ গলা বাড়িয়ে জানতে চাইল।

'কেমন রিস্তাদার?' সাইনবোর্ড আঁকিয়ের বউর ঘাড়ের পাশ থেকে মাদারি খেলোয়াড়ের বউ গলা বাড়িয়ে জানতে চাইল।

'এই—' এবার তো ঝামেলায় পড়া গেল। কিন্তু ঘাবড়ে গেলে চলবে না। তা হলেই ধরা পড়ে যাবে, মেরি তার আত্মীয়-টাত্মীয় কিছুই হয় না। চোখ কান বুঁজে সে বলল, দূর সম্পর্কের রিস্তাদার।

মেরির ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ দেখিয়ে পোস্টার সাটানোর বউ বলল, ওর এই অবস্থা হল কীম করে?

অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

একটু চুপচাপ। তারপর জোহনই আবার বলল, তোমরা মেরির সঙ্গে গল্প-টল্প করো। আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

কাঠের দেওয়াল থেকে ফুলুটের বাক্স নামিয়ে কাঁধে ফেলল সে। মেয়েমানুষগুলো বলল, এখন গল্প করার সময় নেই; রান্না-বান্না চড়াতে হবে।

হুড়মুড় করে যেমন তারা ঢুকেছিল, সেইভাবেই বেরিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে যেতে-যেতে জোহন ঘাড় ফিরিয়ে মেরিকে বলল, আমি যাচ্ছি—

আচ্ছ—

বাইরে বেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরল জোহন। আগে সে যাবে সোমবারিদের ঝোপড়িতে; সেখান থেকে আম্বেদকার রোড ধরে বান্দ্রা স্টেশনে।

মেয়েমানুষগুলো সঙ্গে-সঙ্গেই যাচ্ছিল। ওরা ঝোপড়াপট্রির বাঁ-ধারে থাকে। যেতে-যেতে পোস্টার সাটানোর বউ হঠাৎ চাপা গলায় বলল, একটা সত্যি কথা বলবে ফুলুটবালা?

জোহন বলল, কী কথা?

মেয়েটা তোমার রিস্তাদার হয়, না ভাগিয়ে এনেছ?

জোহান একেবারে হকচাকিয়ে গেল। থতিয়ে-থতিয়ে বলল, ধূস, কী যে যা-তা বল।

কোমর বাঁকিয়ে চুরিয়ে চোখ নাচাতে-নাচাতে মেয়েমানুষটা অশ্লীল শব্দ করে হাসতে লাগল। জোহন আর কিছু বলল না; লম্বা-লম্বা পায়ে মেয়েমানুষগুলোকে পেছনে ফেলে

সোমবারিদের ঝোপড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ছ-সাত দিন কেটে গেল। এর মধ্যে অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে মেরি। বিছানায় আর তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে না। গিল্ডার বলে গেছে আর ইঞ্জেকশনের দরকার নেই; তবে ট্যাবলেট আরও কদিন চলবে। তারপর ঘা-গুলো শুকিয়ে গেলে সেলাই কেটে দিয়ে যাবে সে। সোমবারিকেও নিয়মিত হাজিরা দিয়ে ওষুধপত্র খাওয়াতে হচ্ছে না। ওষুধ-টষুধ নিজেই এখন খাচ্ছে মেরি। তবে সোমবারি দিনে দু-একবার এসে খোঁজ নিয়ে যায়।

এ ক'দিন জোহনের সেই একইভাবে কেটে গেছে। সকালে উঠে চান-টান সেরে চা খেয়েই ফ্লুটের বাক্স ঘাড়ে করে সে বেরিয়ে পড়েছে। ঝোপড়াপট্টি থেকে মিনিট পাঁচেক গেলেই উদিপিদের হতচ্ছাড়া চেহারার একটা লাঞ্চ হোম। সেখানে মেরির জন্য পয়সা দিয়ে গেছে জোহন। লাঞ্চ-হোমের একটা ছোকরা মেরিকে দুপুর-সন্ধে দু-বেলা খাবার পৌঁছে দিয়েছে। আর যথারীতি ক্রফোর্ডে মার্কেটের পেছনে সিন্ধি কি ইরানিদের হোটেলে পাক্কা এক বোতল ঠাররা গিলে এবং রাতের খাওয়া চুকিয়ে অনেক রাত্রে টলতে-টলতে ফিরে এসেছে। ফিরেই মেরির সঙ্গে দু-একটা এলোমেলো কথা। তার শরীর-টরীর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে সেই হওয়া-বালিশ আর চিটচিট চাদরটা বগলে পুরে বাইরের বারান্দায় বিছানা পেতেই লম্বা হয়ে পড়েছে। আর সব ঠিক আছে, কিন্তু এই ব্যাপারটাতেই মেরির দারুণ আপত্তি। আপত্তির কারণটা হল, যার ঘর সে বাইরে পড়ে থাকবে, আর সে একটা উটকো মেয়ে, সে কিনা ঘর দখল করে বসে থাকবে।

সাত-আট দিন বাদে এক সকালে ফ্লুটের বাক্স কাঁধে চাপিয়ে বেরুতে যাবে জোহন, মেরি হঠাৎ বলল, আমার একটা কথা ছিল।

ব্যান্ডপার্টির অফিসে আজ তাড়াতাড়ি পৌছুবার কথা। সেখান থেকে তাদের গোটা দলকে দশটার ভেতর কালেক্টরিতে যেতে হবে। কেন না আজই বোলা বারোটার আগে কর্পোরেশন ইলেকশানের রেজাল্ট বেরুবে। পাটিল সাহেব কাল রাতেও ফোন করে। ইফতিকার সাহেবকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, ঠিক সময়ে ব্যান্ডপার্টি যেন পৌঁছে যায়। তিনি নিশ্চিন্ত আছেন, তার প্রার্থী জিতবেই। রেজাল্ট বেরুবার পর এক মিনিটও দেরি করবেন না। তিনি; সঙ্গে-সঙ্গে ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে জুলুস বার করবেন। কাজেই এখন আর পড়বারর সময় নেই জোহনের। ব্যস্তভাবে সে বলল, কী কথা?

আমি তো এখন ভালো হয়েই গেছি। আর কদিন তোমার ঘাড়ে বসে থাকব! তুমি বললে এবার যেতে পারি।

ডাক্তার এখনও তো তোমার সেলাই-টেলাই কেটে দেয়নি; তা ছাড়া ওষুধও চলছে—

'সেলাই আমি কারওকে দিয়ে কাটিয়ে নেব। ওষুধের আর দরকার হবে না।' বলতে-বলতে একটু থামল মেরি। পরক্ষণেই খুব গাঢ় গলায় শুরু করল, তুমি আমার জন্যে যা করলে—

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল জোহন, ঠিক আছে ঠিক আছে, আজকের দিনটা তুমি অন্তত থেকে যাও। যদি যেতেই হয় কাল যেও। আটটা চল্লিশের ট্রেনটা আমাকে ধরতেই হবে। রাত্তিরে ফিরে আসি; তখন কথাবার্তা হবে।

আচ্ছা—

জোহন বেরিয়ে গেল। সাড়ে ন'টা নাগাদ ব্যান্ডপার্টির অফিসে পৌঁছে সে দেখল দলের সবাই হাজির হয়ে গেছে, তার জন্যই অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ইফতিকার সাহেব। অফিস ঘরে তালা ঝুলিয়ে তাড়া লাগাল, চল-চল, বেরিয়ে পড়া যাক। দশটার ভেতর কালেক্টারি অফিসে না পৌঁছুলে ঘাড়ের ওপর আর শিরটি থাকবে না পাটিল সাহেব—' এই পর্যন্ত বলেই হাত দিয়ে ছুরি চালাবার কায়দা দেখিয়ে গলার ভেতর চক করে একটা শব্দ করল। অর্থাৎ পাটিল সাহেব কচাৎ করে মুণ্ডুটি নামিয়ে দেবেন।

একটু পরেই দেখা গেল। 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি' পায়াধুনি থেকে বেরিয়ে আবদুল রহমান স্ট্রিট ধরে ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে এসে পড়েছে। সবার হাতেই যার-যার নিজের

বাদ্যযন্ত্র। কারও হাতে কর্নেট, কারও ক্লারিওনেট, কারও সোজা পুল, কারও ব্রাস, কারও কাঁধে সাইডড্রাম। স্বয়ং ব্যান্ডমাস্টার-কাম-প্রোপ্রাইটরের বুকে বিগ ড্রাম ঝুলছে।

দূরমনস্কের মতো হেঁটে যাচ্ছিল জোহন। ওধারে একটা উঁচু বাড়ির টাওয়ার-ক্লকে পৌনে দশটা বেজে গেছে। এখন চারদিকে অজস্র মানুষের থিকথিকে ভিড়, হাজার-হাজার প্রাইভেট কার, বাস, ট্রাক, ভ্যান, ট্যাক্সি, আর আছে নানা ধরনের শব্দ, চিৎকার। কিন্তু কিছুই যেন জোহনকে ছুঁতে পারছিল না। বারবার মেরির মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। মেয়েটা মোটে সাত-আট দিন তার কাছে রয়েছে। সারাদিনে ক'টাই বা কথা হয় তার সঙ্গে। সকালে সে বেরিয়ে যায়, ফেরে মাঝরাত্তিরে। তা ছাড়া এমনিতে জোহন, খুবই নিস্পৃহ উদাসীন ধরনের। বম্বে শহরের লক্ষ-লক্ষ মানুষ, চিৎকার, হট্টগোল, কোটি-কোটি টাকার ধাঁধিয়ে দেওয়া ঐশ্বর্য, সব কিছুর ওপর শ্যাওলার মতো সে ভেসে বেড়ায়। তবু মেরির সম্বন্ধে কোথায় যেন মায়া অনুভব করে সে। মেরি তাকে জানিয়েছে, সে খারাপ মেয়ে; পেটের জন্য তাকে শরাবি-ফারেবি-চোর-জুয়াচোর নানা জাতের লোকের সঙ্গে শুতে হয়। তার অকপট, সরল স্বীকারোক্তি শোনার পরও ঘেন্না করতে পারেনি জোহন, ধীরে-বীরে তার সম্বন্ধে কখন যেন নিজের অজান্তে খানিকটা সহানুভূতি বোধ করেছে। সেই মেয়েটা আজ চলে যেতে চেয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। জখম অবস্থায় তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল জোহন; এখন সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার আর থাকার মানে হয় না। তবু কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগছে জোহনের।

আচমকা গায়ের পাশ থেকে হাবিবের গলা শোনা গেল, চাচা—

একটু চমকে উঠল জোহন। ঘাড় ফিরিয়ে হাবিবের দিকে তাকাল, কী বলছিস?

হাবিবের বয়েস খুব বেশি না—সতেরো-আঠারো হবে। ওরা গরিব মোপলা অর্থাৎ মালাবারি মুসলমান। সুদূর মালাবার থেকে পেটের ধান্দার জন্য এই বম্বে শহরে এসেছে। এক বছর হল সে 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-তে আছে। এখানে সে হোল্ডার। ব্যান্ডপার্টির নিজস্ব ইডিয়ামে যাকে ফলস বলে, হাবিব তা-ই। অর্থাৎ বাজনার দলে থেকেও সে বাজনাদার নয়। জিলিপির প্যাচ-খেলানো যে বাদ্যযন্ত্রটির নাম 'সোজা পুল' বাজনার সময় ঘাড়ের ওপর সেটা তুলে মুখটা নিজের মুখের কাছে সেঁটে রাখে হাবিব। এটা ধাপ্পার ব্যাপার। যারা ব্যান্ডপার্টি বায়না করে নিয়ে যায়, তারা দেখে হাবিবও বাজাচ্ছে। আসলে সে বাজায় না, বাজাতে জানেই না। সব দলেই এরকম দু-চারটে ফলস বা ভুয়ো বাজনাদার থাকে। তাদের দেখিয়ে ব্যান্ডপার্টিওলা খদ্দেরের কাছ থেকে পুরো টাকা আদায় করে, অথচ ফলসকে চার-পাঁচ টাকার বেশি মজুরি দেয় না।

হাবিব বলল, আমার কথাটা মনে আছে?

জোহনের চিন্তার মধ্যে মেরির মুখ তখনও ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে বলল, কী কথা রে?

"বা রে, তুমি বলেছিলে না। আমাকে ফ্লুট বাজাতে শেখাবে।

এবার মনে পড়ে গেল জোহনের; শেখাবার কথা সে বলেছিল বটে। অবশ্য এর জন্য কিছুদিন ধরে ছোকরা খুবই ধরাধরি করছে। তার কারণও আছে। ব্যান্ডপার্টিতে ঢুকলে দু-চার বছর ফলস হয়ে থাকা মানে দিনে চার-পাঁচ টাকা রোজগার, তা-ও যখন ব্যান্ডপার্টির হাতে বাজাবার বায়না থাকে। বাজাতে শিখলে মজুরি অবশ্য ঝট করে অনেকটা বেড়ে যায়। তাই ফলসরা দলের বাজনাদারদের ধরে, যদি লুকিয়ে-চুরিয়ে মালিক বা ব্যান্ডমাস্টারকে না জানিয়ে বাজনোটা শিখে নেওয়া যায়। একবার মোটামুটি বাজনা শিখে নিতে পারলে তখন অন্য দলেও যাওয়া যায়। কিন্তু ফলসের কদর কোথাও নেই। তাই যে দলে ফলস হয়ে ঢোকে, তাকে সেখানে ঘাড় গুজে পড়ে থাকতে হয়।

জোহন বলল, হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

মুখটা করুণ করে হাবিব এবার বলল, ইফতিকার সাহেব মোটে চার টাকা মজুরি দেয়। এই বোম্বাই শহরে চার টাকায় কী হয় বলো। দু-বেলা খেতেই চার টাকা লেগে যায়।

তারপর জামাকাপড় আছে বাস ভাড়া, ট্রেন ভাড়া আছে। সকালে-বিকেলে কতকাল যে টিফিন করি না।' একটু থেমে আবার, বলল, 'ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে ঘুরবার পর অন্য কাজ যে করব তার সময়ও নেই। তুমি যদি না শেখাও বিলকুল মরে যাব চাচা!'

ঠিক আছে, শিখিয়ে দেব।

ইফতিকার সাহেব যেন জানতে না পারে। তাকে কিন্তু বোলো না।

ইফতিকার সাহেব এমনিতে বেশ ভালোমানুষ, দরাজ দিল। কিন্তু লুকিয়ে একজন ফলসকে বাজনার তালিম দেওয়াটা বরদাস্ত করবে না। সব ব্যান্ডপার্টির মালিকেরই এক মনোভাব-রাতারাতি একজনকে বাজনাদার বানিয়ে টং-এ চড়িয়ে দিতে নেই। তাতে মাথার ঠিক থাকে না। আগের বাজনাদাররা যখন কষ্ট করে কোনওদিন আধাপেটা খেয়ে দু-চার বছর মাটি কামড়ে পড়ে থাকার পর বাজনা শিখেছে, তখন আজকালকার ছোকরাদের অত তাড়াহুড়ো কীসের? একটু কষ্ট করুক তারা; কিঞ্চিৎ ধৈর্যের পরীক্ষা দিক। এই রীতিটা কোনও ব্যান্ডপার্টির মালিকই সহজে ভাঙতে চায় না।

কিন্তু জোহনের মনটা খুব নরম। অবশ্য সে ব্যান্ডমাস্টারও না, মালিকও না। তার মনোভাবটা এইরকম। আমরা কষ্ট করেছি-করেছি; তাই বলে নতুন ছোকরারা কেন কষ্ট পাবে। সে হেসে হেসে বলল, আরে না-না, ইফতিকার সাহেবকে আমি বলতে যাচ্ছি না। বললে তোর ওপর তো চটবেই আমার ওপরেও খেপে যাবে।

হাবিব বলল, কবে থেকে শেখাবে বলো?

কবে আমাদের দলের বায়না নেই জানিস?

সামনের সপ্তাহে শেষ তিনটে দিন ফাকা আছে। তখন আমরা বেকার।

বহুত আচ্ছা।

সেই সময়টা শিখিয়ে দাও না।

ঠিক আছে।

একটু ভেবে নিয়ে হাবিব বলল, কোথায় শেখাবে? মালিকের চোখের সামনে তো হবে না। দলের অন্য কেউ জানলেও চলবে না; মালিকের কানে চুকলি কেটে দেবে।

জেহন বলল, আসছে সপ্তাহে ওই তিনদিন আমার ঝোপড়পট্টিতে চলে যাবি। সমুদ্রের পাড়টা খুব নিরিবিলি, ওখানে গিয়ে শেখাব।

আচ্ছা।

এরপর আর কোনও কথা হল না।

দশটার দু-তিন মিনিট আগেই 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি' কালেক্টরের অফিসে পৌঁছে গেল।

এখানে এখন দারুণ ভিড়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অগুনতি জিপ, ফ্ল্যাগ, ফেসটুন, প্রাইভেট কার এবং অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকে জায়গাটা এত ঠাসা, যে ভেতরে ছুঁচ ফেলবার ফাঁক নেই। এরই মধ্যে আরও কটা ব্যান্ডপার্টি দেখা গেল। 'শফি ব্যান্ড', 'এলিগেন্ট ব্যান্ড', 'এমব্যাসি ব্যান্ড', 'গ্যালাক্সি ব্যান্ড', 'ইউসুফ ব্যান্ড' ইত্যাদি। বিভিন্ন রাজনীতিক দল এবং তাদের প্রার্থীর এজেন্টরা ওদের নিয়ে এসেছে।

সবারই ধারণা এবং বিশ্বাস তাদের ক্যান্ডিডেটরা নির্বাচনে জিতবেই। ফলাফল একবার জানিয়ে দিলেই হয়, বম্বে শহরের তেলতেলে কংক্রিটের রাস্তা চৌচির করে ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে জুলুস বেরিয়ে পড়বে।

'আনারকলি ব্যান্ডপাটি'-র বাজিয়েরা, বিশেষ করে ইফতিকার সাহেব ডিঙি মেরে-মেরে ভিড়ের ভেতর পাটিল সাহেব কিংবা তার লোকজনদের খুঁজছিল। আরও অনেকবার নির্বাচনী বিজয়োৎসবের সময় পাটিল সাহেবের ডাকে তারা বাজাতে গেছে। তার দলের লোকজনদের অনেককেই চেনে ইফতিকার সাহেব।

খানিকক্ষণ ডিঙি মারার পর খোদ পাটিল সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল ইফতিকার সাহেবের। মধ্যবয়সি, পাতলা চেহারার মানুষ পাটিল সাহেব। গায়ের রং তামাটে।

চুল কাঁচাপাকা। তিনি খুবই ব্যস্ত। একবার কালেক্টরের অফিসে যাচ্ছেন, আবার ফিরে এসে দলের কর্মীদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন। চোখাচোখি হতেই হাত তুলে। ইফতিকার সাহেবকে একটু দাঁড়াতে বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন। বললেন, 'তোমরা এসে গেছ। ভেরি গুড। তবে রেজাল্ট দশটায় বেরুচ্ছে না; ঘণ্টাখানেক দেরি হবে! তোমরা কাছাকাছি থেকো। রেজাল্ট বেরুলেই প্রসেশন বার হবে।'

'জি—' ইফতিকার সাহেব মাথা হেলাল।

'আমি যাচ্ছি—' পাটিল সাহেব দু-হাতে ভিড় ঠেলতে-ঠেলতে চলে গেলেন। আর ইফতিকার জোহানদের সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি একফালি পার্কের কাছে চলে এল। বাদ্যযন্ত্রগুলো পার্কের রেলিঙের গায়ে হেলিয়ে রেখে তারা চওড়া কংক্রিটের ফুটপাথের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। তবে সবার চোখ রইল। কালেক্টরের অফিসের দিকে। অন্য ব্যান্ডপার্টিগুলোও এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের কেউ সিগারেট ফুঁকছে, কেউ ঝিম মেরে খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছে, কেউ বা দলের অন্য বাজিয়েদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করে যাচ্ছে।

ঘন্টাখানেক পর থেকেই ফলাফল ঘোষণা শুরু হল। কালেক্টর অফিসের দোতলায় একটা লাউডস্পিকার লাগানো রয়েছে। সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে, অমুক কেন্দ্রে অমুক দলের অমুক প্রার্থী এত ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। এই কেন্দ্রের অন্যান্য প্রার্থীরা অমুক-অমুক দলের অমুক অমুক ব্যক্তি এই—এই ভোট পেয়েছেন। হিন্দি, মারাঠি গুজরাতি এবং ইংরেজিতে ফলাফল জানানো হচ্ছিচ্ছ।

যে দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছে, রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে তার সমর্থক এবং দলীয় কর্মীরা মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি আর স্লোগান দিয়ে আরবসাগর থেকে উঠে আসা হু-হু বাতাসের শরীর চিরেচিরে দিচ্ছে। তার পরেই দেখা যাচ্ছে প্রার্থীকে খোলা জিপে দাঁড় করিয়ে, পঞ্চাশটা জুঁই বা রজনীগন্ধার মালা তার গলায় চাপিয়ে আগে পিছে ব্যান্ডপার্টি বাজাতে-বাজাতে শোভাযাত্রা বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ঘন-ঘন পতাকারি (আতসবাজি) ফাটছে, আর রঙিন ফাগ উড়ে-উড়ে বাতাস লাল হয়ে যাচ্ছে।

সাত-আটটা রেজাল্ট বেরিয়ে যাবার পর একসঙ্গে দুটি পাশাপাশি কেন্দ্রের ফলাফল বেরুল। দুই পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলের দুজন প্রার্থী এই কেন্দ্র দুটিতে জিতেছেন। তাদের একজন হলেন পাটিল সাহেবের পার্টির ক্যান্ডিডেট।

রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য দলের ব্যান্ডপার্টি বেজে উঠল। সেই সঙ্গে দুমদাম আতসবাজি ফাটতে লাগল। একটু পর দেখা গেল। গলায় ফুলের মালার পাহাড় নিয়ে, ওই দলের প্রার্থী খোলা জিপে এসে দাঁড়িয়েছেন।

জোহনরা এখন কী করবে, ভাবছে। ইফতিকার সাহেব পায়ের বুড়ো আঙুলে ডিঙি মেরেমেরে কালেক্টর অফিসের সামনের দিকের ভিড়টা দেখতে-দেখতে বলতে লাগল, 'পাটিল সাহেবের পার্টি জিতল, কিন্তু ওদের কারওকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কেউ ডাকতেও তো এল না।'

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই দেখা গেল বুকে পাটিল সাহেবদের পার্টির ব্যাজ আঁটা একটা ছোকরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে আসছে। সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, চলে এসো, চলে এসো—

দু-মিনিট বাদেই চোখে পড়ল, ইফতিকার সাহেব 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'—কে কালেক্টরের অফিসের সামনে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড় করিয়ে নিয়ে ব্যান্ডমাস্টার হিসেবে বিগ ড্রামে ঘা দিতে-দিতে বলছে, 'বাজাও ভাই-ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি—'

ফলসরা বাদে অন্য বাজিয়েরা যে যার বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগল। পাটিল সাহেবদের প্রার্থীও মালা ঘাড়ে করে ফাগ বৃষ্টির মধ্যে জোড়হাতে একটা জিপে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পাশে স্বয়ং পাটিল সাহেব। তাদের দলের কর্মী এবং সমর্থকরাও পটকা ফাটিয়ে আর উন্মাদের মতো জয়ধ্বনি দিয়ে-দিয়ে কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

একটু পর ব্যান্ডপার্টি বাজাতে-বাজাতে দুই দলের দুই বিজয়ী প্রার্থীর জুলুস বেরুল। দু'দলের নির্বাচন কেন্দ্র পাশাপাশি। আপাতত তারা নিজের-নিজের কেন্দ্রে গিয়ে ভোটদাতাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাবে।

কালেক্টরের অফিস থেকে বেরিয়ে শোভাযাত্রা দুটো গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে। পি-এম মেটা রোড, দাদাভাই নওরোজি রোড পেরিয়ে কারনাক রোড আর ক্রফোর্ড মার্কেট পিছনে ফেলে ঘণ্টাখানেক পর তারা সেনট্রাল বম্বেতে এসে পড়ল। তাদের নির্বাচন কেন্দ্র এখানেই।

এতক্ষণ তারা সৎ প্রতিবেশীর মতো পাশাপাশি ভালোই এসেছিল। কালেক্টরের অফিস থেকে এতদূর পর্যন্ত রাস্তা ছিল বেশ চওড়া। দুই জুলুস পাশাপাশি আসতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এবার সামনে একটা সরু গলি পড়ল। এই গলি দিয়ে কিছুটা গেলে পাটিল সাহেবদের বিজয়ী প্রর্থীর নির্বাচন কেন্দ্র। সেটা পার হলে অন্য বিজয়ী প্রার্থীটির কনস্টিটিউয়েন্সি।

এখন প্রশ্ন, কার জুলুস আগে গলিতে ঢুকবে? পাটিল সাহেবের সমর্থকরা চায় তাদের শোভাযাত্রা আগে যাবে; অন্য দলটির সমর্থকরা চাইছে তাদের শোভাযাত্রা আগে যাবে। এই নিয়ে তর্কাতর্কি চিৎকার শুরু হয়ে গেল। ক্রমশ উত্তেজনা চরমে উঠল। কোনও দল অন্য দলটিকে আগে যেতে দেবে না।

পাটিল সাহেবের মতো অন্য দলটিতেও বয়স্ক ঠান্ডা মাথার লোক আছে। এই সামান্য কারণে তাঁরা ঝামেলা ঝঞ্ঝাট চান না। দু-হাত তুলে তাঁরা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, কী হচ্ছে এসব? শান্ত হও—'

কিন্তু কমবয়েসি মাথা-গরম সমর্থক এবং কর্মীদের কানে এসব ঢুকল না। ফুটপাথের ওপর রাস্তা মেরামতের জন্য বড়-বড় পাথরের টুকরো স্তূপাকার হয়ে ছিল। আচমকা দুই দলই পাথর তুলে ছুঁড়তে লাগল। মুহুর্তে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার বেধে গেল। যে যেদিকে পারছে এখন ছুটছে। জোহন হঠাৎ লক্ষ করল, তার আশেপাশে 'আনারকলি ব্যান্ডপাটি'-র একটি বাজনাদারও নেই। সবাই হুটহাট সরে পড়েছে। দূর থেকে ইফতিকার সাহেবের গলা একবার শোনা গেল, 'জোহন পালা, পালা—'

উড়ন্ত চাকির মতো চারদিক থেকে পাথরের চাঁইগুলো ছুটে আসছিল। দিশেহারার মতো এক দিকে-উত্তর না। দক্ষিণ, পুবে না পশ্চিমে, জোহন জানে না, দৌড় লাগাল। কিন্তু দশ গজও যায়নি, তার আগেই মনে হল, মাথায় ধাঁ করে এক কেজি ওজনের কিছু একটা এসে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে জোহনের চোখের সামনে কয়েক কোটি হলুদ ফুল ফুটে উঠেই সব অন্ধকার হয়ে গেল। মাথার যেখানটায় লেগেছে। অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে একবার ছুঁল সে; টের পেল ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। টলতে-টলতে আরও দু-পা এগিয়ে যেতেই, মুখের ওপর আবার একশো মাইল স্পিডে আরেকটা পাথরের টুকরো এসে পড়ল। জোহনের মনে হল তার নাকটা ছ'ইঞ্চি ভেতরে বসে গেল। পরক্ষণে হুড়মুড় করে রাস্তার ওপর ঘাড়মুখ গুজে পড়ে গেল সে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জোহনের যখন জ্ঞান ফিরল, বেশ রাত হয়েছে। সে দেখল, ঝোপড়াপট্টিতে নিজের দড়ির খাটিয়ায় সে শুয়ে আছে, আর তাকে ঘিরে অনেকে বসে আছে। যেমন ইফতিকার সাহেব, ডাক্তার গিল্ডার, ব্যান্ডপার্টির দুজন বাজনদার, সোমবারি। আর মেরি।

স্নায়ুগুলো এখন খুবই দুর্বল আর ক্লান্ত, তবু আস্তে-আস্তে টুকরো টুকরোভাবে পাটিল সাহেব, জুলুস, ব্যান্ডপার্টি, সেনট্রাল বম্বের সেই সরু গলি, দু-দলের সমর্থকদের পাথর ছোড়াছুড়ি, সব মনে পড়ে গেল। জোহন আন্দাজ করল, অজ্ঞান হবার পর ইফতিকার সাহেবরাই তাকে ডান্ডা কোস্টের এই ঝোপড়াপট্টিতে নিয়ে এসেছে।

ইফতিকার সাহেব বলল, 'যাক, জ্ঞান ফিরেছে, বাঁচলাম।'

বলতে-বলতেই ডাক্তার গিল্ডারের দিকে তাকাল, 'ভয়ের কিছু নেই তো ডাক্তারসাব?'

গিল্ডার বলল, না। পাঁচ-সাতদিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে ঠিকমতো ওষুধ-টোষুধ খেতে হবে, আর ঠাররা একেবারেই না।

পুরোনো আমলের একটা ঢাউস পকেটঘড়ি আছে ইফতিকার সাহেবের। সেটা বার করে এক পলক দেখে সে বলল, 'সাড়ে ন'টা বাজে। অনেক রাত হল, এবার উঠি।' জোহনকে বলল, কিছু চিন্তা নেই, আমি আবার এসে দেখে যাব—' বলতে-বলতে উঠে পড়ল। তারপর আচমকা কী মনে পড়তেই পকেটে হাত পুরে একতাড়া নোট বার করে জোহনের বালিশের তলায় গুজে দিয়ে বলল, 'শ' দেড়েক আছে। দরকার হলে পরে আবার দিয়ে যাব।'

ইফতিকার সাহেব তার ব্যান্ডপার্টির অন্য দুই বাজনাদার স্টিফেন আর আবদুলকে নিয়ে চলে গেল।

গিল্ডার বলল, আমিও এবার যাই। বলেই সোমবারির দিকে ফিরল, 'ফ্লুটবালাকে একটু দেখো, ঠিক সময়ে ওষুধ খাইয়ে দিও। ও শালা যা শরাবি, নজর রেখো। উঠে গিয়ে যেন আবার ভাটিখানায় না ঢোকে।'

সোমবারিদের সঙ্গে জোহনের সম্পর্কটা ভালো করেই জানে গিল্ডার। জোহনের অসুখ-বিসুখ হলে সোমবারিই দেখাশোনা করে থাকে।

সোমবারি ঠোঁট কামড়ে বলল, 'আমি কেন, ফ্লুটবলার ঘরে ওষুধ খাওয়াবার লোক তো আছে—' চোখের কোণ দিয়ে মেরিকে দেখিয়ে দিল সে।

একটু থতিয়ে গেল গিল্ডার। দ্রুত একবার মেরিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ও, তাহলে তো—আচ্ছা, ঠিক আছে। রাত হল, আমিও যাই।' সে চলে গেল।

ঘরের ভেতর এখন জোহন, মেরি এবং সোমবারি ছাড়া আর কেউ নেই। সোমবারি উত্তরপ্রদেশের মজাদার অশ্লীল একটা ছড়া কেটে চোখ নাচিয়ে বলল, 'তোমরা কিন্তু বেশ লাগিয়েছ। ফ্লুটবালা—'

দুর্বল গলায় জোহন জানতে চাইল, 'কী লাগিয়েছি?'

'একবার তোমার মেরি জখম হয়ে আসছে, একবার তুমি জখম হয়ে আসছ। মেরিকে আমি দেখাশোনা করেছি। মেরি এবার তোমার দেখাশোনা করুক। রোজ-রোজ নিজের ঘর-সংসার ফেলে আমি তোমার ঝোপড়িতে এসে বসে থাকতে পারব না।' বলতে-বলতে একটু থামল সোমবারি। পরক্ষণে নিজের স্বামীর কথা তুলে আবার শুরু করল, 'যাই, জুয়াড়িটা সাট্টা-ফাট্টা খেলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘরে ফিরে এসেছে। সে যা-ই হোক, শরাবি-ফারেবি-জুয়াড়ি, তবু তো আপনা মরদ, ঘরবালা। তাকে দানাপানি দিতে হবে।' সোমবারি চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মেরি বলল, 'তোমার জন্যে ভাবী দুধ কিনে রেখে গেছে। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

জোহন কিছু বলল না। ওধারে সেই সস্তা টেবিলটার ওপর প্লাস্টিকের একটা মাগে দুধ ছিল। কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে সেই দুধটা গরম করে জোহনকে খেতে দিল মেরি। খাওয়াবার পর বলল, 'তুমি আমাকে ফাঁসিয়ে দিলে ফ্লুটবালা?'

জেহন জানতে চাইল, কীরকম?

ভেবেছিলাম কাল সকালে চলে যাব। আর তোমার ঘাড়ে বসে থাকব না। কিন্তু তুমি যা কান্ড বধিয়ে এলে তাতে যাই কী করে?

জোহনের ক্লান্ত, নির্জীব চোখ জোড়া পলকের জন্য চকচাকিয়ে উঠল, তোমাকে কে যেতে বলছে?

দ্রুত ঘাড় ফেরাল মেরি। একদৃষ্টি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর চাপা গলায় বলল, থেকে যেতে বলছ?

হ্যাঁ।

কদ্দিন?

তোমার যদিন ইচ্ছে।
কোথাও থাকতে পেলে তো আমি বেঁচে যাই। কিন্তু—
মেরিকে খুবই দ্বিধান্বিত দেখাল।
‘কী?’ আস্তে করে জিগ্যেস করল জোহ্ন।

মেরি একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে তো বলেছি। আমি খারাপ মেয়ে।

ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

তাছাড়া আর-একটা কথা-হুট করে আমি তোমার কাছে এলাম, থাকছি, লোকে কী বলবো?

ঝোপড়াপটির লোকেদের এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর মেরি হঠাৎ বলল, আগে তুমি ভালো হয়ে ওঠ। তারপর ভেবে দেখব কী করা যায়।

জোহন উত্তর দিল না।

মেরি কী চিন্তা করে বলল, আমি যখন জখম হয়েছিলাম ঘরে শুয়েছি; তুমি শুয়েছ বাইরে। তোমার তো এখন নড়াচড়ার সাধ্যি নেই। আমি বাইরে শুতে যাচ্ছি।

না-না, তুমি মেয়েমানুষ; খোলা বারান্দায় শোওয়া ঠিক না।

তাহলে?

জোহন চোখ-কান বুজে বলে ফেলল, তুমি এই ঘরেই থাকো, নীচে বিছানা করে নাও।

সেই যে জোহন জখম হয়ে এসেছিল, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে তার বেশ সময় লেগে গেল। এই অবস্থায় তাকে ফেলে মেরির পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভব হল না। যে লোকটা একদিন রাস্তা থেকে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীর তুলে এনে প্রাণে বাঁচিয়েছে, তাকে এভাবে ফেলে যাওয়া যায় না। যাই হোক কোনদিনই নিয়ম-টিয়মের ধার ধারে না জোহন। আজ বোলা বারোটায় খেল, তো কাল খেল বিকেল পাঁচটায়, পরশু হয়তো খেলই না। আর খাওয়াটাও কি রোজ একরকম জোটে! একদিন উদিপিদের লাঞ্চ হোমে খেলে, পরের দিন সে ইরানি কিংবা পাঞ্জাবিদের হোটেলে গিয়ে ঢোকে, তার পরের দিন হয়তো যায়। গুজরাতিদের শাকাহারী ভোজনালয়ে। মোট কথা, তার যেধরনের কাজ, তাতে জীবনটাকে ঠিকঠাক নিয়মে বাঁধা যায় না। যতরকম অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা থাকতে পারে, তার মধ্যে দিয়ে জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে জোহনের। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, ওষুধ-টোষুধ খেতে চিরদিনই তার দারুণ আপত্তি।

কিন্তু তার আপত্তি শুনছে কে? ডাক্তার গিল্ডার যেমন- যেমন বলে গেছে, ঠিক সেইভাবে ঘড়ির কাঁটা ধরে গাদা-গাদা ট্যাবলেট আর মিক্সচার খাইয়ে যাচ্ছে মেরি। শুধু কি তাই, সকাল সাতটায় দুধ আর পাও, বারোটায় উদ্দিপি হোটেলের অর্ধেক ভাত, অর্ধেক পুরি, বিকেল চারটেয় ফল আর দুধ, রাত্রি ন'টায় উদিপি হোটেলের চাপটি তরকারি খেতে হচ্ছে।

এত নিয়মে চলা জোহনের ধাতে নেই। তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু আপত্তি করলেই কখনও বালিকা-বধুর মতো গাল ফুলিয়ে, কখনও বহুকালের অভিজ্ঞ ঝুনু হাউস-ওয়াইফের মতো ধমকে-ধামকে খাইয়ে যাচ্ছে মেরি। এরকম শেকলে বাঁধা থাকার জন্য খুবই অস্বস্তি হচ্ছে জোহনের। তবু ভালোই লাগছে ব্যাপারটা। তার জীবনে এটা একেবারে নতুন। মেরির মতো এভাবে রাগ বা অভিমান করে কিংবা ছেলে-ভুলানোর মতো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গভীর মমতায় কেউ তাকে কাছে বসিয়ে কখনও খাওয়ায় নি। মেয়েটা বিলকুল তার ক্যারেক্টর খারাপ করে দিচ্ছে। এরই মধ্যে দিনে তিনবার করে সোমবারি আসছে। চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে একবার মেরিকে দেখে সে, আর-একবার দেখে জোহনকে। তারপর উত্তরপ্রদেশের অশ্লীল একটি ছড়া কেটে বলে, 'ভালোই চালাচ্ছ ফুলুটবালা।' বলেই একচোখ বুজে, ঠোঁট কামড়ে, হাসতে-হাসতে চলে যায়।

ইফতিকার সাহেবও রোজ একবার করে আসে। তবে তার আসার নির্দিষ্ট সময় নেই। কোনও— কোনও দিন সকালের দিকে আসে সে, কোনওদিন বা বায়না অনুযায়ী ব্যান্ড বাজাবার পর মাঝ রাত্তিরে এসে হাজির হয়। তাকে কাছে বসিয়ে জোহন বলে, 'আজ কোথায় বাজাতে গিয়েছিলে?'

ইফতিকার সাহেব বলে, যোগেশ্বরীতে। এক গুজরাটি শেঠের মেয়ের সাল-গিরা

(জন্মদিন) ছিল।'

'আজকাল সাল-গিরাতেও ব্যান্ডপাটিও ডাকছে নাকি?' জোহান অবাক হয়।

চড়বাড়িয়ে একনাগাড়ে খানিকক্ষণ খিস্তি করল ইফতিকার সাহেব। খিস্তিটার কোনও কারণ বা গুরুত্ব নেই। ওটা তার কথার মাত্রা। খিস্তি-ফিস্তির পর জানালা দিয়ে পিচিৎ করে পানের পিক ফেলে এসে বলল, 'বিয়ে শাদি, ভোটের রিজাল (রেজাল্ট), এসব তো আছেই। মানুষ মরে গেলেও এখন সামনে-পেছনে ব্যান্ড বাজিয়ে গোরস্থানে কি শ্মশানে নিয়ে যাবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'এরপর দেখবি বড়লোকদের পেচ্ছাপ পেলেও ব্যান্ডওলাদের ডাক পড়বে।'

জোহন অন্যমনস্কের মতো বলল, 'হাঁ। আচ্ছা চাচা, আমার জায়গায় এখন কে ফ্লুট বাজাচ্ছে?'

আসলাম।

কে আসলাম? 'নবি ব্যান্ডপার্টি'-র সেই দুবালা পাতলা ছোকরাটা নাকি?

হাঁ। তুই নেই, কাজ চালাবার জন্যে ওকে ধার করে এনেছি।

কীরকম বাজাচ্ছে?

'শালে হারামি কী বাজাবে! 'নবি ব্যান্ড'-এর ব্যান্ডমাস্টার মুবিন নবি নিজে কিছু বাজাতে জানে যে ওরা দলের লোক বাজাবে!' ঢল নামানোর মতো একগাদা খিস্তি করে। ইফতিকার সাহেব বলল, 'তুই জখম হয়ে বিছানায় পড়ে আছিস; ওকে ঠেকা দেবার জন্যে আনতে হল। নইলে ওর যা বাজনা, ওতে আমি পেচ্ছাপ করে দিই। ছেঃ—' বলেই আবার পানের পিচ ফেলে এল!

জেহন বলল, জখম হয়ে তোমাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি, তাই না চাচা?

'তা একটু ফেলেছিস। কিন্তু ও-নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। তুই খাড়া হলে আমি বেঁচে যাই।' বলতে-বলতে একটু থামে ইফতিকার সাহেব। তারপর আবার বলে, তুই যা হারামি, গাধ্ধেকা পাঠ্ঠে, ঠিকমতো ওষুধ-টোযুধ খাচ্ছিস?

মেরিকে দেখিয়ে দিয়ে জোহন বলে, এরা পাল্লায় পড়েছি, না খেয়ে উপায় আছে! লাইফ একেবারে অ্যাসিড করে দিচ্ছে।

এতক্ষণ যেন মেরিকে দেখতে পায়নি ইফতিকার সাহেব। চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একপলক তাকে দেখে মুখটা জোহনের কানের কাছে নিয়ে এল সে। চাপা গলায় বলল, ওহী লড়কি?

হ্যাঁ।

এখনও আছে?

ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে জোহন বলে, হাঁ।

ইফতিকার সাহেব বলল, 'বিলকুল জমে গেছিস মনে হচ্ছে। শালে শুয়ারকা বাচ্চা, ছোকরি যখন তোর ঝোপড়িতে ঢুকেই পড়েছে, আর ছাড়িস না।' বলেই ঝাঁট কর খাড়া হয়ে সে মেরিকে বলল, 'এ চিটমবাজ ছোকরি—' চিটমবাজ কথাটার কী অর্থ একমাত্র ইফতিকার সাহেবই বলতে পারবো! খিস্তি-টিস্তির ব্যাপারে নতুন কিছু কিছু শব্দ সে উদ্ভাবন করেছে। মানে থাক বা না-ই থাক, কথায়-কথায় সেগুলো সে অনর্গল বলে যায়।

মেরি ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে বলে, কী বলছেন?

জোহান শালেকে জলদি সারিয়ে তোলো। যদি সাতদিনে সেরে ওঠে, তোমাকে একটা দারুণ তওফা (উপহার) দেব।

বলেই চোখের তারা দুটো দ্রুত একবার এ-কোণে, একবার ও-কোণে নিয়ে জোহন আর মেরিকে দেখে নিল।

মেরি উত্তর দিল না।

ইফতিকার সাহেব আবার বলল, আর এখানে এসে যখন একবার ঢুকেছ, এখানেই

জমে যাও। সামঝী?

মেরি এবারও চুপ।।

ইফতিকার সাহেব বলতে থাকে, অনেক রাত হল। ট্যাক্সি ধরে এখন আমাকে কোলাবা ছুটতে হবে। বারোটার সময় সেই আওরতটার কাছে পৌঁছনোর কথা।' বুক পকেট থেকে চেনে-বাঁধা ঢাউস-পকেট ঘড়িটা বার করেই আঁতকে উঠল। ইফতিকার সাহেব, 'আরে বাপ, পৌনে বারোটা বাজে। আমার বারো বাজ গিয়া। আজ বাকি রাত মাগিটা জরুর আমাকে দরজার বাইরে ফেলে রাখবে। যাই রে, কাল আবার আসব।' যাবার আগে মেরির খুতনিতে টোকা দিয়ে বলে যায়, চিটমবাজ ছোকরি, আমার কথাটা ইয়াদ রাখিস।'

সোমবারি বা ইফতিকার সাহেবই না, সোমবারির ঘরবালা জুয়াড়ি রেসুড়ে আজবলাল, ডাক্তার গিল্ডার, আনারকলি ব্যান্ডপার্টি-র সেই ফলস বাজনাদার ছোকরা হাবিব এবং ঝোপড়পট্টির অন্যান্য লোকজনও জোহনের খোঁজখবর নিতে আসে।

দিন কয়েকের মধ্যে অনেকটা ভালো হয়ে উঠল জোহন। তবে প্রচুর রক্তপাতের ফলে শরীরটা এখনও বেশ দুর্বল। একটু চললে ফিরলেই মাথা ঘোরে। নাকে-মুখে এবং মাথায় ব্যান্ডেজটা আছেই। গিল্ডার বলে গেছে এখনও অন্তত পনেরো দিন তার ঘর থেকে বেরুনো চলবে না।

এখন সকাল সাতটার মতো বাজে। দড়ির খাটিয়ায় নিজের বিছানাটার ওপর বসে ছিল জোহন। নীচে বসে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে দুধ গরম করছিল মেরি। হঠাৎ সে বলল, এভাবে আমার ভালো লাগছে না।

একটু অবাক হয়েই জোহন তাকাল। মেরি কী বলতে চায় সে বুঝতে পারছে না।

মেরি আবার বলল, রোজ-রোজ উদিপিদের হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যাচ্ছে, এর কোনও মানে হয়?

জোহন বলল, উদ্দিপিদের খাবার তোমার ভালো না লাগলে এক কাজ করি। একটু দূরে একটা খালসা হোটেল আছে। তাদের বরং খাবার দিয়ে যেতে বলি।

আমি কী বললাম। আর তুমি কী বুঝলে! হোটেল থেকে কিছু আনতে হবে না।

জোহন বিমূঢ়ের মতো জিগ্যেস করল, তা হলে?

মেরি বলল, কাজ নেই, কর্ম নেই, দিনরাত হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে বাতে ধরে গেল।

কী করতে চাও?

তক্ষুনি উত্তর দিল না মেরি। একটু চুপ করে থেকে বলল, কোরোসিন স্টোভ তো আছেই। আমাকে হাঁড়ি-কড়া আর দু-একটা বাসন-কোসন কারোকে দিয়ে কিনিয়ে দাও না। টাকা-পয়সা দিলে আমিও কিনে আনতে পারি।

একটু অবাক হয়ে জোহন বলল, রান্নাবান্না শুরু করবে নাকি?

কত আর বেকার বসে থাকা যায়!

সত্যি-সত্যিই জোহনকে দুধ-পাও এবং ওষুধ খাইয়ে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে তিন মাইল দূরের খারের বাজার থেকে বাসন-কোসন, প্লাস্টিকের বালতি, চাল-ডাল আর কিছু সবজি কিনে আনল মেরি। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে কোমরে শক্ত করে শাড়ি জড়িয়ে, প্রথমে ঝোপড়াপট্টির মাঝখানের সেই কলটা থেকে জল নিয়ে এল। তারপর সামনের ঘেরা বারান্দাটার একাধারে কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে রান্না চড়িয়ে দিল।

দড়ির খাটিয়ায় বসে অবাক চোখে দেখেই যাচ্ছে জোহন, দেখেই যাচ্ছে, আর যত দেখছে বিস্ময়টা ততই বেড়ে যাচ্ছে। কুড়ি-বাইশটা বছর ঝোপড়াপট্টির এই ঘরে কেটে গেল তার। কিন্তু এই দৃশ্যটা জোহনের কাছে একেবারে নতুন এবং চমকপ্রদও। কোনও মেয়ে তার ঘরে এসে এভাবে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াবে, কোনওদিন সে এসব ভেবে দেখেনি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না হয়ে গেল মেরির। ভাত-ডাল ইত্যাদি বাটি এবং

ডেকচিতে করে ঘরের ভেতর এনে রাখল মেরি। স্টোভটা নিভিয়ে দিয়েছে; আপাতত সেটা বারান্দাতেই থাকল। হাতের কাজ-টাজ শেষ করে মেরি জোহনের দিকে তাকাল। তার কপালে এবং গলায় দানাদানা ঘাম জমেছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছতে-মুছতে একটু হাসল সে। বলল, 'ডেকচি-কাটোরা, থালা-গেলাস কিনে তোমার অনেক খরচ করিয়ে দিলাম।

জোহন জখম হয়ে আসার পর, বেশ কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল ইফতিকার সাহেব। তার থেকে ষাট-সত্তরটা টাকা খরচ করেছে মেরি। জোহন বলল, আরে না-না—

মেরি বলল, খরচ তোমার একদিনই একটু বেশি হল। তারপর দেখবে ঘরে রান্না করে খেলে হোটেলের চাইতে ঢের সস্তায় হবে।

আমার পয়সা বাঁচাবার জন্যে বুঝি তোমার ঘুম হচ্ছিল না?

তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমার কথা আমার তো একটু ভাবতেই হবে।

ঠিক এরকম স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব আশা করেনি জোহন। তবু তার ভালোই লাগল। মেরি আবার বলল, ঠিক পয়সা বাঁচাবার জন্যে নয়; আসলে আমার একটা কাজ তো দরকার। দেখ তো কটা বাজে?

জোহন যেখানে বসে আছে তার বাঁ-পাশের ছোট জানালা দিয়ে দূরে একটা গির্জার মাথায় টাওয়ার-ক্লক দেখা যায়। চট করে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে জোহন বলল, বারোটা বাজতে দশ মিনিট—

মেরি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'বারোটায় তোমার খাবার সময়। যাই, চানটা সেরে আসি—' বলেই কোণের দিকে টাঙানো দড়িটা থেকে একটা বিছানার চাদর আর বড়সড় পুরোনো একটা তোয়ালে নিয়ে কাঁধে চাপাল।

হঠাৎ জোহনের মনে পড়ে গেল, মেরি যে শাড়ি-ব্লাউজ পরে আছে সেগুলো ছাড়া তার আর বাড়তি পোশাক নেই। যেদিন রাস্তা থেকে তাকে তুলে এনেছিল, সেদিনও এগুলোই তার গায়ে ছিল। একটা শাড়ি আর একটা ব্লাউজ দিয়ে দিনের-পর-দিন চালানো যায়? তা ছাড়া ওগুলোর যা হাল! রক্তের দাগড়া-দাগড়া ছোপ লেগে রয়েছে। জোহন লক্ষ্য করেনি। তবে তার মনে হল, মেয়েটা চান-টান করে বিছানার চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসে থাকে; তারপর শাড়ি শুকোলে পরে নেয়। এত কষ্ট করার কোনও মানে হয়! সে বলল, 'তুমি কী বলো তো!'

মেরি হতভম্বের মতো বলল, কী আমি।

খারে গিয়ে গোটা বাজারটাই কিনে আনলে। আর আসল জিনিসটাই আনতে ভুলে গেলে?

মানে?

নিজের জন্যে শাড়ি-ব্লাউজ তো কিনে আনবে। আমার ঘরে কি মেয়েমানুষ আছে যে এসব ব্যাপারে। আমার হুঁশ থাকবে; তোমাকে কিনতে বলে দেবার কথা কি 'আমার মাথায় ছিল? এক শাড়ি এক ব্লাউজে কি চালানো যায়।'

মেরি জানালো, নতুন শাড়ি-টাড়ি কেনবার দরকার নেই। কিং সার্কেল স্টেশনের গায়ে যে ঝোপড়াপট্টিটা, সেখানে তার অনেক জামাকাপড় রয়েছে। সে ভেবেই রেখেছিল একটু ভালো হয়ে উঠলে তার জিনিসপত্র নিয়ে আসবে। আজ তো জোহন অনেকটা সুস্থ, আজই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে কিং সার্কেলে যাবে।

পৃথিবীর কোনও কিছু সম্বন্ধে বিশেষ টান বা আকর্ষণ বোধ করে না জোহন। তবু এই মুহূর্তে তার মনে হল, বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, তুমি ফিরে আসবে তো?

তার বলার ভঙ্গিতে উদ্বেগের মতো কিছু একটা জড়ানো।

মেরি হাসল, তুমি আমার প্রাণ বঁচিয়েছ; তোমাকে এভাবে ফেলে আমি পালাব না। তবে তুমি একেবারে ভালো হয়ে গেলে আর থাকা কি ঠিক হবে?

জোহনের চোখ এবার চকচাকিয়ে ওঠে। সে বলল, তখনকার কথা তখন ভাবা

যাবে। যাও, চান করে এসো।

মেরি চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে বেড কভারে গা ঢেকে ফিরে এল সে। ভেজা শাড়ি আর জামাটা শুকোতে দিয়ে চুল-টুল আচড়ে জোহনকে খেতে দিল।

খাবারের আয়োজন সামান্যই। ভাত, আমটি (টক ডাল), কিছু ভাজা-টাজা আর পাঁপড়।

জোহন মনে করতে পারছে না, কেউ কখনও এভাবে নিজের হাতে রেঁধে-টেঁধে কাছে বসে তাকে খাইয়েছে কি না। বাবা বেঁচে থাকতে ডকইয়ার্ড রোড স্টেশনের গায়ের সেই ঝোপড়পট্টিটায় যখন তারা থাকত তখন কচড়া জ্বালিয়ে বেশিরভাগ দিন তাকেই রাঁধতে হয়েছে। বাবা মরে গেলে পাঞ্জাবি-গুজরাতি-সিন্ধি-ইরানি-উদিপি নানা জাতের হোটেলে খেয়ে-খেয়েই তিরিশ-বত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিল সে। নিজের ঘরে বসে একটি যুবতী মেয়ের রান্না ভাত-সবজি সে কোনওদিন খেতে পাবে, কখনও কি তা ভাবতে পেরেছিল! অদ্ভুত এক আবেগ ফুটন্ত দুধের মতো বুকের ভেতর উথলেউথলে উঠতে লাগল জোহনের।

মেরি বলল, কি হল, চুপচাপ বসে কেন? খাও—

জোহন গাঢ় গলায় বলল, 'হাঁ, খাচ্ছি।' বলেই আমটির বাটিটা ভাতের ওপর ঢেলে দিল।

মেরি এবার বলল, তোমার হোটেলে খাওয়া অভ্যেস; আমার রান্না নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না।

ভাত মুখে দিয়ে জোহন বলল, কোন শালে বললে ভালো লাগবে না! ফাইন বেঁধেছ। তোমার হাত দুটো চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

মেরি খুবই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। খুশিতে তার মুখটা ঝকমকিয়ে উঠল। কিছু না বলে একটু লাজুক হাসি হাসল সে। হোটেলে এর চাইতে অনেক ভালোই খায় জোহন। কিন্তু মেরির এই রান্না, কাছে বসিয়ে খাওয়ানো উদিপি হোটেলের গাদা-গাদা লোকের ভিড়, ভনভনে হট্টগোল কিংবা বয়দের ছোটাছুটি আর দায়সারা সারভিসের ভেতর পাওয়া যায় না। খুব ভালো লাগছে তার, খুবই ভালো লাগছে।

জোহনের খাওয়া হয়ে গেলে নিজেও খেয়ে নিল মেরি। এর মধ্যে তার শাড়ি-টাড়ি শুকিয়ে গিয়েছিল। বারান্দার কোণে গিয়ে বেড-কভার ছেড়ে শাড়িটা পরে নিল। তারপর ঘরে এসে জোহনকে বলল, আমি তা হলে কিং সার্কেল থেকে ঘুরে আসি?

জোহন ঘাড় কত করল, আচ্ছা—

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একটা ঢাউস কাপড়ের ব্যাগে যাবতীয় জামাকাপড় এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল মেরি।

সেই যে মেরি রান্না-বান্না শুরু করেছিল, এখন সেটা দু-বেলাই চালিয়ে যাচ্ছে। ভোরে উঠে প্রথমেই সে ঘর-টর পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর ঝোপড়পট্টির কাল থেকে জল নিয়ে আসে। এসেই আধ মাইল দূরে মিল্ক বুথ থেকে, দুধ আর বাজার থেকে পাও কিনে আনে। তারপর দুধটুধ গরম করে জোহনকে খেতে দেয়, নিজেও এক কাপ চা করে খেয়েই ছোটে খারের বাজারে। তবে বাজারে সে রোজ যায় না; একদিন অন্তর যায়। যেদিন বাজারে যায় সেদিন ফিরে এসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে রান্না চাপায়। যেদিন যায় না সেদিন টুকিটাকি ঘরের কাজ সেরে কিংবা জোহন ও তার ময়লা কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করে রাঁধতে বসে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বড় জোর ঘণ্টাখানেক শুয়ে নেয় মেরি। তারপরেই আবার স্টোভ ধরিয়ে এটা-সেটা করে জোহনকে খাওয়ায়। সন্ধে হতে-নো-হতেই আবার রাতের খাবার তৈরি করতে বসে। নটা বাজাতে-না-বাজতেই জোহনকে খাইয়ে জোর করে শুইয়ে দ্যায়।

জোহান অবাক চোখে মেয়েটাকে শুধু দেখেই যাচ্ছে, দেখেই যাচ্ছে। মেরি তাকে বলেছে, সে খুবই বাজে মেয়ে। এই বম্বে শহরে কোলাবা থেকে বোরিভিলি পর্যন্ত যে কয়েক

হাজার বেশ্যা পোকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে-মেরি তাদেরই একজন। সে একটা নোংরা ফ্লাইং প্রস্টিটিউট। যত রাজ্যের বদমাশ-লম্পট-গুন্ডার সঙ্গে তার নাকি কারবার। কিন্তু এই মেয়েটা যে রাঁধে-বাড়ে এবং পরম মমতায় জোহনকে খাওয়ায়, তার সঙ্গে শরাবি-ফারেবিদের সঙ্গিনী বেশ্যা মেরির আদৌ কোনও মিল নেই। ঝোপড়পট্টির পেটা টিন আর প্যাকিং বাক্সের এই ঘরটায় একটু-একটু করে গভীর আবেগে একটা সংসারের ছাঁদ ফুটিয়ে তুলছে সে।

জোহনের ভালোই লাগছে। তার জীবনে এ-এক নতুন এবং আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এক-এক সময় জোহন ভাবে সে পুরোপুরি সুস্থ হলে মেয়েটা হয়তো চলে যাবে। তাকে চিরকাল তো আর আটকে রাখা যাবে না। তবু যদ্দিন থাকে এই নোংরা জঘন্য গন্ধ ঝোপড়াপট্টিতে সে নিজের মনে ফুল ফুটিয়ে যাক।

দেখতে-দেখতে আরও দিনসাতেক কেটে গেল। জখম হয়ে আসার পর জোহন তার দড়ির খাটিয়াটায় শুতো, আর মেরি নীচে বিছানা পেতে নিত। কিন্তু জোহন এখন অনেক সুস্থ। দু-তিন দিন ধরে রাত্রিবেলা সে বাইরের বরান্দায় শুচ্ছে, মেরি থাকছে ঘরে।

মেরির অবশ্য এতে খুবই আপত্তি। সে বলেছে, এটা কী হচ্ছে ফুলুটবালা!

ঝোপড়াপট্টির অন্য সবার দেখাদেখি আজকাল জোহনকে সে ফুলুটবালাই বলে থাকে। জোহন হেসে-হেসে বলেছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

দেখ ফুলুটবালা, তোমার এখানে আসার আগে এই বম্বে শহরের কয়েক হাজার লোকের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটাতে হয়েছে আমাকে। তুমি আর আমি একঘরে থাকলে আমার গায়ের চামড়া অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

ঠিক এই কথাগুলোই আরও একবার বলেছিল মেরি। কিন্তু হাজার আপত্তি বা জোর করেও রাত্রিবেলা জোহনকে ঘরে শোওয়ানো যায়নি।

যাই হোক, এরই মধ্যে একদিন দুপুরের দিকে ইফতিকার সাহেব। আর সেই ফলস বাজনাদার ছোকরা হাবিব এসে হাজির। ইফতিকার সাহেব মাঝখানে বেশ কয়েকদিন আসেনি। খুব সম্ভব নানা জায়গায় বাজাতে গিয়ে আসার সময় করে উঠতে পারেনি।

মেরি তখন বারান্দায় বসে রান্না করছিল। কোমরে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ তাকে ঘুরে-ফিরে দেখল ইফতিকার সাহেব। দেখতে-দেখতে একচোট বগবগিয়ে হাসল। তারপর আচমকা এক হ্যাঁচকায় হাসিটা থামিয়ে দিয়ে গমগমে গলায় বলে উঠল, বাহ, বহুত আচ্ছা—

ক'দিন যাতায়াতের ফলে মেরির সঙ্গে তার ভালোই আলাপ হয়েছে। মেরি বুঝে ফেলেছে লোকটা আমুদে, হাসিখুশি আর দারুণ মজাদার। ঘাড় ফিরিয়ে সে বলল, কী বহুত আচ্ছা?

ইফতিকার সাহেব বলল, এই যে রান্না করে ওই শালেকে খাওয়াচ্ছিস।' আজ মেরিকে 'তুই' করেই বলতে শুরু করে দিল সে, চিটমবাজ ছোকরি, চালিয়ে যা টমটম, চালিয়ে যা—'

মেরি হাসতে-হাসতে বলল, 'দেখা যাক।' বলে একটু চুপ করল। তারপর আবার বলল, 'এবার কিন্তু তুমি অনেকদিন পর এলে চাচা।'

ইফতিকার সাহেব বলল, 'হাঁ, রোজ সকাল থেকে মাঝরাত্তির অব্দি দু-শিফটে বাজাতে হয়েছে। আসি কী করে? সেই গাধধে কা পাঠঠেটা কোথায়?'

এই মধুর সম্ভাষণটা কার উদ্দেশ্যে মেরি বুঝতে পারল। বলল, যাও, ঘরেই আছে। চা আর পকোড়া নিয়ে যাচ্ছি।

ঘরে গিয়ে ঢুকাল ইফতিকার সাহেব। তার পিছু-পিছু ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো হাবিবও ঘরে ঢুকেই চড়বড়িয়ে মিনিট তিনকে খিস্তি দিয়ে গেল ইফতিকার। তারপর জানলা দিয়ে পানের পিচ ফেলে এসে বলল, এখন কেমন আছিস?

জোহন বলল, অনেক ভালো।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ছোকরিকে নিয়ে রোলস রয়েস চালিয়ে যাচ্ছ।

কিন্তু চাচা, একটা ঝামেলা হয়েছে। ক'দিন ধরে গলায় এক ফোঁটা ঠাররা পড়ছে

না। জিভটিভ শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে।

শালে উল্লু-কা-বান্দর! ঠিক আছে, তোর ঠাররার বন্দোবস্ত করে যাব। লেকিন আমার কী হবে? কবে বাজাতে আসছিস?

জোহন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আরেক প্রস্থ খিস্তি দিয়ে ইফতিকার সাহেব। আবার যা বলল তা এইরকম- 'নবি ব্যান্ড'-এর সেই ক্লারিওনেটওলাকে কাজ চালাবার জন্য ডেকে এনে দলের মান ইজ্জত ডুবতে বসেছে। শালার কলিজায় না আছে দম, গলায় না আছে সুর। সে একটা ফুঁ দিলে ক্ল্যারিওনেট থেকে একসঙ্গে বাইশ রকম আওয়াজ বেরোয়। এই নিয়ে তিন চার জায়গায় যা-তা কাণ্ড হয়ে গেছে। কাস্টমাররা দলের পাওনা টাকা থেকে টাকা কেটে নিতে চেয়েছে। কাটার কথাই। নগদ পয়সা দেবে; বাজনা খারাপ হলে তারা ছেড়ে দেবে কেন? তিন-চার জায়গায় খিস্তি করে-করে কাস্টমাররা তার বাপ-মা-চোদ্দৌ-পুরুষকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা কি ইফতিকার সাহেবের বাপের সম্বন্ধী না ভায়রাভাই, যে যা বাজাবে তাতেই তাদের মেজাজ তার হয়ে যাবে! এখন মেহেরবানি করে জোহন যদি বাজাতে যায় তো দলের মুখরক্ষা হয়। আর সে গেলেই নিবি ব্যান্ড'-এর ওই গাধধেক পাঠঠের পাছায় গুনে-গুনে বারোটা লাথি হাঁকিয়ে ভাগিয়ে দেবে।

সব শুনে চুপ করে রইল জোহন। কেন না আজই সকলে ডাক্তার গিল্ডার এসে বলে গেছে, আরও আট-দশ দিন তার বেরুনো চলবে না। ক্ল্যারিওনেট বাজানো খুবই পরিশ্রমের কাজ। ফুসফুস থেকে হাওয়া বের করে একনাগাড়ে সাত-আট ঘণ্টা বাজাতে হলে মাথার দুর্বল শিরাগুলো ছিড়ে যেতে পারে। কিন্তু ওদিকে আনারকলি ব্যান্ডপার্টি-র সুনাম যেতে বসেছে।

ইফতিকার সাহেব এবার অসহিষ্ণুভাবে বলল, কি রে, স্ক্রু দিয়ে মুখটা আটকে রাখলি যে। কিছু বলবি তো—

জোহন খানিকটা ইতস্তত করে কাঁচমাচু মুখে গিল্ডারের কথাগুলো বলে একটু থামল। তারপর বলল, এখন তুমি আমাকে কী করতে বলো?

তিন মিনিট ধরে নতুন উদ্যমে তার স্বভাবসিদ্ধ খিস্তিটিস্তি করে। ইফতিকার সাহেব বলল, কুত্তাকে বকরা, আমি একটা মানুষ না জানোয়ার-আগে তাই বল?

জোহন হকচকিয়ে গেল, 'কী বলছ চাচা!' কিন্তু কে কার কথা শোনে, ইফতিকার সাহেব চিৎকার করে সেই একই কথা বলে গেল। অর্থাৎ সে মানুষ না জানোয়ার, এই প্রশ্নটার উত্তর জোহনকে দিতেই হবে। জোহনকে স্বীকার করতেই হল, ইফতিকার সাহেব অবশ্যই একটা মানুষ, জানোয়ার নয়।

ইফতিকার সাহেব এবার বলল,"আমি যদি মানুষই হই তোকে এই অবস্থায় যেতে বলতে পারি? যদিন ডাক্তার তোকে বাজাতে না দিচ্ছে, তদিন বাজাতে হবে না। এতে যদি আমার ব্যান্ডপাটি উঠে যায় তো যাবে।

কৃতজ্ঞতায় চোখে প্রায় জল এসে গেল জোহনের। সে কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ওদের কথাবার্তার মধ্যেই একসময় চা-পকোড়া দিয়ে গেল মেরি। আরও কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে জোহনকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে একসময় উঠে পড়ল ইফতিকার সাহেব। যখনই সে আসে, কিছু টাকা দিয়ে যায়।

একধারে চুপচাপ বসে ছিল হাবিব। ইফতিকার সাহেব তাকে বলল, চল আমার সঙ্গে। তারপর জোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, ছোকরাকে নিয়ে গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যে ওকে দিয়ে একটা জিনিস পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিমূঢ়ের মতো যোহন বলল, কী জিনিস?

'শালে গাধধে কা পাঠঠে।' বলেই ঝাপ করে গলার স্বরটা নামিয়ে দিল। ইফতিকার সাহেব, 'তখন বলছিলি না। গলা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে। একটা ঠাররার বোতল দরকার হবে না?'

'চাচা তোমার জবাব নেই।' জোহন হাত বাড়িয়ে ইফতিকার সাহেবের কোমরটা

জড়িয়ে ধরল।

আলতো করে চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ইফতিকার সাহেব। আদরের সুরে বলল, 'কুত্তা কা-বকরি! ছোড় শালে, ছোড়।'

একটু পরে হাবিবকে নিয়ে চলে গেল ইফতিকার সাহেব। আধঘণ্টা নয়, পুরো ঘণ্টা দেড়েক বাদে খবরের কাগজে মুড়ে একটা পেটমোটা ঠাররার বোতল হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এল হাবিব। এর মধ্যে জোহানদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জোহন তার দড়ির খাটিয়াটায় শুয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দূরে ছবির মত ধু-ধু সমুদ্র দেখছিল; দিগন্তের ফ্রেমে আটকানো একটা নীল কাচের মতো সেটা পড়ে আছে। অগুনতি জেলে নৌকো, দু-চারটি স্পিড বোট-যতদূর চোখ যায় কালো-কালো ফুটকির মতো ছড়িয়ে আছে। আর দেখা যাচ্ছে সি-গাল পাখিগুলোকে। ঝকঝকে নীলাকাশে দুপুরের ঝলমলে রোদ গায়ে মেখে পাখিগুলো দাঁড়ের মতো ডানা ছড়িয়ে দিয়ে বাতাস কেটে-কেটে উড়ছিল। মেরি বাইরের বারান্দায় তেরপলের একটা টুকরো পেতে শুয়ে পড়েছে। দিনের বেলাটা মেরি বাইরের বারান্দায় শোয়; তখন ঘরে থাকে জোহন। রাত্রে অবশ্য তারা জায়গা বদলে নেয়। এখন এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

হাবিব ঘরে ঢুকে ঠাররার বোতলটা জোহনের হাতে দিয়ে খাটিয়ার একাধারে হাত-পা গুটিয়ে বসল।

কাগজের মোড়ক খুলে বোতলাটা বার করে সস্নেহে হাত বোলাতে লাগল জোহন। জখম হয়ে ঝোপড়াপট্টিতে ঢোকার পর এই প্রথম সে মদের বোতলের চেহারা দেখল। ঠারারার অভাবে এ ক'দিন সে সাধু-মাহাত্মার জীবন যাপন করছিল। ইফতিকার চাচার দারুণ বিবেচনা; ঠাররা বিহনে তার যে খুবই অসুবিধা হচ্ছে, সেটা ঠিকই ধরে ফেলেছে সে। এইজন্যে লোকটাকে তার এত ভালো লাগে। যাক, অনেকদিন বাদে আজকের সন্ধেটা জমবে ভালো।

কিছুক্ষণ হাত-টাত বুলিয়ে বোতলটা খাটিয়ার তলায় রাখল জোহন। তারপর হাবিবের দিকে ফিরে বলল, তোর খবর বল।

হাবিব বলল, আমার সব খবরই তো তুমি জানো; নতুন কিছু নেই।

একটু থেমে আবার বলল, চার টাকা মজুরি পাই; এতে কী হয় বলো। নিজে খাব, না বাড়িতে পাঠাব? বাড়িতে কিছু না পাঠালে বাপ-মা ভুখা মরে যাবে।

এসব খবর জোহন জানে। তবু নতুন করে ছেলেটার জন্য আর-একবার সহানুভূতি বোধ করল সে।

হাবিব এবার বলল, এখন তুমিই ভরোসা চাচা। তুমি যদি তাড়াতাড়ি তালিম দিয়ে ফ্লুট বাজনাটা শিখিয়ে দাও বেঁচে যেতে পারি; নইলে খুদকুশি (আত্মহত্যা) হয়ে মরতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে জোহন ভাবলা। তারপর বলল, ঠিক আছে, তোকে তালিম দেব। যে ক'দিন ঘরে আটকে আছি, রোজ আসতে পারবি?

আসছে সপ্তাহে দু-দিন দলের বায়না আছে। একদিন বাজাতে যেতে হবে কল্যাণ, আরএকদিন অম্বরনাথ, তার পরের সপ্তাহে বায়না নেই। ওই দু-দিন বাদ দিয়ে দুসপ্তাহের সব দিন আসতে পারব। তবে এর মধ্যে যদি নতুন বায়না এসে পড়ে তো আসা যাবে না।

ঠিক আছে, দু-দিন বাদ দিয়ে আপাতত আসতে থাক। নতুন বায়না এলে পরে ভাবা যাবে।

হাবিবের দু-চোখ আশায় খুশিতে চকচক করতে লাগল। ঝুঁকে জোহনের পা ছুঁয়ে সে বলল, চাচা গোটা জিন্দেগি আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

দু-কাঁধ ধরে হাবিবকে তুলতে-তুলতে জোহন বলল, গোলাম আবার কী। তুই তালিম নিয়ে পয়সা কামাতে শিখলেই আমি খুশি। তবে একটা কন্ডিশন—

এই হাজার জাতের কসমোপলিটান বম্বে শহরে সবাই কথায় কথায় ইংরেজির খই ফোটায়। জোহন গোয়াঞ্চি ক্রিশচান অর্থাৎ পিদ্রু। ইংরেজিটা আজন্ম তার রক্তের মধ্যেই

রয়েছে, তবে সেটা ভুল-ভাল ইংরেজি। অন্য সবার মতো ইংরেজি মেশানো হিন্দিটাই সে বেশি বলে থাকে।

হাবিব বলল, তুমি যে কন্ডিশান বলবে, আমি তাতেই রাজি।

আমি তোকে তালিম দিচ্ছি। এ-কথা যেন কেউ জানতে না পারে। জানিসই তো এ-লাইনে এভাবে কেউ তালিম দেয় না; দু-চার বছর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হয়। ইফতিকার চাচার কানে যদি কথাটা যায় দারুণ ঝামেলা হয়ে যাবে। আমি সাদাসিধা ভোলাভালা একটা লোক। আমি কিন্তু কোনও লাফড়ায় যেতে পারব না।

হাবিব বলল, ব্যান্ড বাজিয়ে হয়ে আমি ইফতিকার চাচাকে একথা বলতে যাব, এটা তুমি ভাবতে পারলে! আমার কি মাথা খারাপ! কীসে আমার ভালো, কীসে বুরা (মন্দ), জানি না!

ঠিক আছে, কাল সকালে চলে আসিস। দুপুরে ফিরতে হবে না। আমার এখানেই খাবি।

কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল হাবিবের। জোহনের মনে হল, ছোকরা বোধহয় কেঁদেই ফেলবে। বুঝবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে বলল, যা, এবার ভাগ, আর হাঁ-একটা কথা, তোর ফ্লুট আছে?

পয়সা জমিয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড ফ্লুট কিনেছি, তবে খুব ভালো না

ভেরি গুড। ওতেই চলবে।

হাবিব চলে যাবার পর জানালার বাইরে আবার তাকাল জোহন। তারপর সমুদ্র আর আকাশের ফ্রেমে আটকানো একটু আগের সেই ছবিটা দেখতে-দেখতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

টানা একটা ঘুম লাগিয়ে জোহন যখন উঠল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ডান্ডা কোস্টের এই দিকটার ওপর পাতলা ওড়নার মতো আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। সমুদ্র বা আকাশ, কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না; সব ঝাপসা।

সে উঠবার সঙ্গে-সঙ্গে মেরি খুঁট করে আলো জেলে দুধ টুধ খেতে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঠারুরার বোতলটার কথা জোহনের মনে পড়ল। খাটিয়ার তলায় সেটি মজুত রয়েছে। ঘরে আস্ত একটা বোতল থাকতে দুধ খেতে কারও ভালো লাগে, না দুধ খাওয়ার মানে হয়? কিন্তু সে-কথাটা মেরিকে বলা গেল না। কেন না এই ক'দিনের মধ্যেই সে বুঝে ফেলেছে, মেয়েটা ভীষণ একরোখা আর জেদি। সে যা বলবে তাই করতে হবে, যা করবে তাই মেনে নিতে হবে। তবে এখন পর্যন্ত অন্যায় বা অসঙ্গত কোনও জেদ সে ধরেনি। যেটুকু করেছে সবই জোহনকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করবার কথা ভেবে।

বাইরে থেকে মুখ-টুখ ধুয়ে এসে জোহন গুচ্ছের চিরতা গেলার মতো মুখ করে এক নিশ্বাসে দুধটা খেয়ে ফেলল; তারপর শুকনো স্টোন চিপস চিবুনোর মতো করে চিকু আর পেঁপে খেতে লাগল।

জোহনকে খেতে দিয়ে মেরি এক কাপ চা আর কড়কড়ে টোস্ট বিস্কুট নিয়ে মেঝেতে বসে ছিল। দু-জনের খাওয়া হয়ে গেলে অ্যালুমিনিয়মের প্লেট গেলাস-টেলাস নিয়ে বাইরে চলে গেল।

একটু পর জোহন দেখতে পেল মেরি বারান্দায় বসে রান্নার জোগাড়যন্ত্র করছে।

খাটিয়া থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে এল জোহন। মেরির সঙ্গে এলোমেলো দু-একটা কথা বলে ঝোপড়পট্টির রাস্তায় গিয়ে নামল।

মেরি পিছন থেকে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

জোহন বলল, সারাদিনই তো ঘরে বসে আছি, একটু ঘুরে টুরে আসি। হাত-পায়ে জং ধরে যাচ্ছে।

বেশি দুরে যেয়ো না।

আরে না-না—

ঝোপড়পট্টির ভেতর এলোমেলো ঘুরতে লাগল জোহন। এর মধ্যে ঘরো-ঘরে এবং দূরে রাস্তায় কর্পোরেশনের আলো জ্বলে উঠেছে। ঘুরতে-ঘুরতে মাদারি খেলোয়াড়ের ঘরে একবার ঢুঁ মারল জোহন। মাদারি খেলোয়াড় নেই, তার বউ রয়েছে। তার সঙ্গে দু-একটা মজার কথা বলে পোস্টার সাঁটিয়ের ঘরে উঁকি দিল। সেখানে এক কাপ চা খেয়ে গেল সোমবারিদের ঘরে। খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে আবার নিজের আস্তানার দিকে চলল।

ঘুরছে ফিরছে লোকের সঙ্গে গল্প-টল্প করছে, মজার-মজার কথাও বলছে, তবু মাথার মধ্যে সেই ঠারবার বোতলটা আটকে আছে। দুধ খেয়েই ওটার ছিপি খুলবে ভেবেছিল; কী ভেবে খোলেনি। এখন মুখ থেকে দুধের গন্ধ মিলিয়ে গেছে। কুপড়িতে ফিরে এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করবে না। জোহন, বোতল খুলে ফেলবে।

ঘরে এসে সত্যি-সত্যিই বোতলটা খুলে ফেলল জোহন। টেবিলের ওপর একটা হাতল-ভাঙা কাপ উপুড় করা ছিল, সেটা চিত করে ঠাররা ঢেলে নিল। তারপর মেরিকে ডেকে পাপড় সেঁকে সঙ্গে পেঁয়াজ কুচিয়ে দিতে বলবে, ঠিক সেই সময় মেরি নিজে এসেই হাজির। খুব সম্ভব রান্নার জন্য মশলাপাতি নিতে ঘরে ঢুকেছে সে। কাপ-ভর্তি ঠাররা এবং পাশে একটা খোলা বোতল দেখে প্রথমে চক্ষুস্থির। পরমুহূর্তে আঙুল বাড়িয়ে ঠাররা দেখিয়ে বলল, ওটা কী?

জোহন এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে বলল, ওটার জন্যেই তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম; তার আগেই গড তোমাকে পাঠিয়ে দিলে। এক কাজ করো, চট করে ক'টা পাপড় সেঁকে, পেয়াজ কুচিয়ে নিয়ে এসো।

চোখ দুটো এখনও স্থির হয়েই আছে মেরির। সে বলল, ঠাররা পেলে কোথায়?

সে পেয়েছি—

ওটা কেনবার জন্যেই বুঝি বাইরে যাওয়া হয়েছিল?

আরে না-না, ওটা ঘরেই ছিল।

ঘরে এল কী করে-উড়ে? বোতলটার ডানা আছে নাকি?

জোহন ভেতরে-ভেতরে টের পেল, লক্ষণ ভালো নয়। সে মিটিমিটি হাসতে লাগল; তবে তার সঙ্গে একটু ভয়ের ভাবও মেশানো।

মেরি এবার বলল, ডাক্তার না তোমাকে সেদিন বলে গেল এখন শরাব খাবে না!' মেয়েটার স্মৃতিশক্তি তো দারুণ। গিল্ডার সত্যি-সত্যি তাকে ঠাররা-ফাররা খেতে বারণ করে গেছে। কিন্তু বেছে-বেছে এই কথাটা মনে রাখার কী এমন দরকার ছিল? চুরি ধরা পড়ে যাবার মতো গলায় জোহন বলল, বারণ করেছিল নাকি?

'মনে পড়ছে না?' সোজাসুজি জোহনের দিকে তাকাল মেরি।

জোহন উসখুস করতে লাগল, না ঠিক, তবে—

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মেরি জিগ্যেস করল, তবে কী?

বললেও গিল্ডার ডাক্তারের কথা মেনে চলার দরকার নেই।

কেন?

শরাবিকে শরাব খেতে বারণ করছে, এ-কথা মানতে হবে? তা ছাড়া ও নাম-কাটা ডাক্তার। ওর রেজিস্ট্রেশন কেড়ে নিয়েছে। ওর সব কথা না মানলেও চলে।

এবার চাপা গলায় মেরি বলল, তোমার মতলব খুব খারাপ।

দম-আটকানো স্বরে জোহন জিগ্যেস করল, কেন?

ভেবেছিলাম, তুমি আর-একটু ভালো হয়ে উঠলেই চলে যাব। ভালো হবার কোনও ইচ্ছাই তোমার দেখছি না। ঠাররা গিলে আবার শরীর খারাপ করে বোসো; তা হলেই আমাকে আরও কিছুদিন ফাঁসাতে পারো। কিন্তু ও চালাকি তোমার চলবে না।

এই ঝোপড়াপট্টিতে এসে বেশ পোষ মেনে যাচ্ছিল মেরি। এতদিন কোলাবা থেকে বোরিভিলি পর্যন্ত শরাবি-ফারেবি-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বেড়াত সে; সেই উড়ুক্কু ভাবটা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল তার। এখানে, এই নোংরা জঘন্য কুৎসিত ঝোপড়িতে একটা

সংসারের চেহারা একটু-একটু করে ফুটিয়ে তুলতেও শুরু করেছিল। আচমকা আবার এখান থেকে চলে যাবার কথা কেন বলছে, কে জানে! মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল জোহনের। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দুম করে এক কান্ড করে বসল মেরি; ঠাররার বোতলটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। তারপর কাপটা নিয়ে গিয়ে সবটুকু ঠার্‌রা বাইরে ঢেলে ফেলল।

পরের দিন সকালে আটটা বাজতে না বাজতেই হাবিব তার সেকেন্ড হ্যান্ড ক্ল্যারিওনেটখানা নিয়ে হাজির। আসামাত্র দেরি করল না জোহন; নিজের ক্ল্যারিওনেটের বাক্সটা কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, চল, সি-র ধারে যাই।

জোহনের ইচ্ছা, সমুদ্রের পাড়ে নিরিবিলিতে হাবিবকে তালিম দেবে। তা ছাড়া ঝোপড়াপট্টিতে বাজনা শেখাতে বসলে লোকের চোখে পড়বে। জানাজানি হাতে-হাতে হয়তো ইফতিকার সাহেবের কানে চলে যাবে খবরটা। তাছাড়া দুম করে ইফতিকার সাহেব নিজেই কখন এসে হাজির হয়।

জোহনরা যখন ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছে, মেরি বলল, কোথায় চললে?

জোহনের হঠাৎ খেয়াল হল, মেরিকে হাতে রাখা দরকার। সংক্ষেপে হাবিবের ব্যাপারটা জানিয়ে সে মেরিকে বলল, সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি। হাবিবের তালিম নেবার কথা কারওকে বোলো না।

আচ্ছা। কিন্তু ডাক্তার বলছিল, ফ্লুট বাজালে মাথার শিরে চোট লাগবে।

অনেকক্ষণ বাজালে চোট লাগবে বলেছে। হাবিবকে একটু-আধটু দেখিয়ে দেব। খুব আস্তেআস্তে বাজাব- নিজেকে বাঁচিয়ে। তুমি ভেবো না।

মেরি আর কিছু বলল না। হাবিবকে নিয়ে জোহন ঝোপড়াপট্টির ভেতর দিয়ে সি-কোস্টের দিকে চলল। তার কাঁধে ক্ল্যারিওনেটের বাক্স দেখে ঝোপড়াপট্টির দু-ধারের ঘর থেকে গাদা-গাদা বাচ্চা ছুটে এসে তাকে মাছির মতো ছেকে ধরতে লাগল। তাকে ঘিরে ধরে যেতে-যেতে ভ্যানভেনে গলায় বলতে লাগল, জোহনচাচা, আজ কিন্তু বাজনা শোনাতে হবে। কিছুতেই তোমাকে ছাড়ছি না।

সময় পেলেই ঝোপড়পট্টির, বাচ্চাদের সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে গিয়ে ক্ল্যারিওনেট শোনায় জোহন। মাঝখানে 'আনারকলি ব্যান্ড'-এর হাতে এত বায়না ছিল যে, অনেকদিন ওদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাওয়া হয়নি। জোহন বলল, আচ্ছা চল। কিন্তু একটার বেশি গান বাজাব না কিন্তু। আমাদের কাজ আছে।

ছেলের দল তাতেই রাজি।

সি-কোস্টে এসে প্রথমে একটা চটকদার হিন্দি ছবির গান বাজিয়ে শোনাল জোহন। একটি গান বাজিয়েই বেশ হাঁপিয়ে গেল সে। মাথার পিছন দিকটা দপদপ করছে। নাঃ, শরীরটা ভালো রকমই জখম হয়েছে। গিল্ডার ঠিকই বলেছে, আরও কিছুদিন তাকে ঝোপড়াপট্টিতে চুপচাপ পড়ে থাকতে হবে।

খানিকটা জিরিয়ে দমবন্ধ ভাবটা আর মাথার দপদপানি কমলে বাচ্চাগুলোকে আগে ঝোপড়পট্টিতে পাঠিয়ে দিল জোহন। তারপর ছোট্ট একটা গত বাজিয়ে হাবিবকে বলল, বাজা —

একবারেই সুরটা তুলতে পারল না হাবিব। তিন-চারবার দেখাবার পর সুরাটা তুলে নিল। ইতিমধ্যে বেলা বেশ চড়ে গেছে। আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে-বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। ভোরবেলা যে জেলে-নৌকা আর স্পিডবোটগুলো বেরিয়ে পড়েছিল, সমুদ্রের দুর দিগন্ত থেকে সেগুলো একে-একে ফিরে আসতে শুরু করেছে। আকাশের কোথাও একটা সিগাল দেখা যাচ্ছে না; সাগরপাখিগুলো অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে। আরবসাগর এই মুহূর্তে জুন মাসের গানগনে রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে। সেদিকে কেউ তাকিয়ে থাকবে, সাধ্য কী।

জোহন বলল, চল, এবার ফেরা যাক। ওবেলা আবার আসব।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল জোহন। হাবিবের দুপুরে ঘুমনোর অভ্যোস নেই। সে মেঝেতে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে গেল। তারপর বেলা হলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে রোদের রং যখন ঘন হয়ে এল, সূর্য যখন আরবসাগরের জল ছুঁই-ছুঁই করছে, সেই সময় ঘুম ভাঙল জোহনের। তাড়াতাড়ি মুখ-টুখ ধুয়ে হাবিবকে নিয়ে আবার সমুদ্রের পাড়ে এল। তাকে অন্য একটা গত তালিম দিতে-দিতে সন্ধে হয়ে গেল। একসময় ক্ল্যারিওনেটখানা মুখ থেকে নামিয়ে বাক্সে পুরতে-পুরতে জোহন বলল, আজ থাক, কাল আবার আসিস।

হাবিবও তার ক্ল্যারিওনেটটা খাপে পুরে বলল, নিশ্চয়ই আসব, তবে খাব না।

জোহন হাসল, কেন রে?

একে তো বাজনা শেখাচ্ছ। তার ওপর রোজ-রোজ খেলে তোমার ওপর জুলুম করা হবে চাচা। তা আমি পারব না।

বহুত পয়সা হয়েছে বুঝি তোর? টিকিট কেটে ভেন্ডিবাজার থেকে এখানে আসছিস; তার ওপর হোটেলে খাবি! একটা কথা শুনে রাখ উল্লু-কা বান্দর-'গালাগালটা ইফতিকার সাহেবকে নকল করেই দিল জোহান।

'কী কথা?' —ভয়ে-ভয়ে তাকাল হাবিব।

যদি না খাস, তালিম দিতে পারব না। সাফ বাত।

ঠিক আছে, খাব।

ঘাবড়ে গিয়ে এবার বলে ফেলল হাবিব।

'বহুত আচ্ছা—' হাবিবের পিঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিল জোহন।

একটু পর দেখা গেল ঝোপড়পট্টির কাছাকাছি এসে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে সোজা ঘোড়বন্দর রোডের দিকে চলে গেল হাবিব। ওখান থেকে বাসে উঠে সোজা বান্দ্রা স্টেশনে গিয়ে হারবার লাইনের ট্রেন ধরবে। আর জোহন ক্ল্যারিওনেটের বাক্সখানা কাঁধে চাপিয়ে দূরমনস্কর মতো হাঁটতে-হাঁটতে ঝোপড়াপট্টিতে এসে ঢুকল। নিজের ঘরের কাছে আসতেই তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ঘরের ভেতর তার ট্রানজিস্টর রেডিওটা চলছে হয়তো। আশ্চর্য সুরেলা একটা গান সেখান থেকে ভেসে আসছে। মেরিকে বারান্দায় দেখা গেল না। খুব সম্ভব ঘরে বসে ট্রানজিস্টরটা চালিয়ে দিয়ে সে শুনছে।

বাইরে থেকে জোহন আস্তে করে ডাকল, 'মেরি—' ডেকেই সে বারান্দায় উঠে এল।

সঙ্গে-সঙ্গে গানটা থেমে গেল। আমি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মেরি।

জোহন বলল, এ কী, রেডিওটা বন্ধ করে দিলে কেন। ফাইন গান হচ্ছিল।

একটু অবাক হয়ে মেরি বলল, রেডিও বাজছিল না।

হঠাৎ জোহনের মনে পড়ে গেল, রেডিওটা চলার কথা নয়। কয়েক মাস আগে ওটার ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর আর নতুন ব্যাটারি কিনে এনে লাগানো হয়নি। ওই অবস্থাতেই ওটা টেবলে পড়ে আছে। বিমূঢ়ের মতো জোহন বলল, তা হলে?

তা হলে কী?

গান শুনলাম যে !

মেরি দ্রুত একবার জোহনের দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিল। তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝে ফেলল জোহন। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে বিস্ময়ের সুরে বলল, তুমি গাইছিলে নাকি!

মেরি উত্তর দিল না। তার মুখটা এখন দেখার মতো। লজ্জায় সেখানে লালচে ছোপ ধরেছে। যে মেয়ে অকপটে নিজের গ্লানিকর পেশার কথা বলেছে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে যে জানিয়েছে সে একটা দারুণ খারাপ মেয়ে, একটা বাজে টাইপের প্রস্টিটিউট-তারা এখনকার মুখ দেখে কিন্তু অবাক হতে হয়। আচমকা তার সব চাইতে গোপন লজ্জার কারণটা যেন জোহনের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

জোহন আবার বলল, চুপ করে আছ কেন? তুমিই গাইছিলে?

মুখ তুলল না মেরি। সেই অবস্থাতেই আধাফোটা গলায় বলল, হ্যাঁ।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতের মুঠোয় গাদা-গাদা সোনার মোহর পেয়ে গেলে যেমন হয়, জোহনের এখনকার মনের অবস্থা অনেকটা সেইরকম। মেরির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেতে লাগল। মিনিটখানেক এইভাবেই কাটল। তারপর মেরির একটা হাত ধরে তাকে প্রায় উড়িয়েই ঘরের ভেতর নিয়ে এল জোহন। কাঁধ থেকে ক্ল্যারিওনেটের বাক্সটা নামিয়ে রেখে মেরিকে খাটিয়ায় বসিয়ে দিল। পরক্ষণে নিজের কোমরে হাত দুটো রেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এটা কীরকম হল?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেয়ে মেরি জিগ্যেস করল, কোনটা?

পনেরো-ষোলো দিন তুমি এখানে আছ। কই আমাকে বলোনি তো এত ভালো গাইতে পারো তুমি!

লাজুক হেসে মেরি বলল, যাঃ! একে আবার ভালো গাওয়া বলে নাকি!

মোটা এবং গাঁট-পাকানো তর্জনীর ডগা দিয়ে মেরির খুতনিটা তুলে ধরে জোহন বলল, তোমার গলায় আনারের দানা বসানো আছে। তুমি গাইলে লতা মঙ্গেশকর আর আশা ভোঁসলের মতো নাম করতে পারবে।

জোহনের আঙুলটা সরিয়ে দিয়ে মেরি বলল, কী যে বল! কাদের সঙ্গে কার তুলনা। তোমার মাথা খারাপ।

জোহন বলল, আমি একটা গরিব আদমি-এ পুওর ম্যান। ব্যান্ডপার্টিতে ফ্লুট বাজাই, ঠাররা খাই আর ঝোপড়পট্টিতে পড়ে থাকি বলে আমার কথা কানে তুলতে চাইছ না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ছোকরি—দিস ম্যান, দিস। 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র ফ্লুটবালা, হাঁ করে একটা আওয়াজ বার করলে বলে দিতে পারে, কার গলায় সুর খেলবে, আর কার গলায় খেলবে না।'

রগড়ের গলায় মেরি এবার বলল, তুমি দেখছি খুব সমঝদার আদমি।

জরুর, হাজারবার। একটু আগে যে গানটা গাইতে-গাইতে থেমে গিয়েছিলে, সেটা পুরো গেয়ে ফ্যালো দেখি।

'হ্যাঁ, এটা তো গান গাইবারই সময়। আমার বলে এখন রান্না চড়াতে হবে।' বলেই উঠে পড়ল মেরি।

তার দু-কাঁধ ধরে আবার বসিয়ে দিল জোহন। বলল, 'রান্না-টান্না ফায়ার করে দাও। নো কুকিং বিজনেস নাউ, এখন শুধু গান-স্টার্ট।'

তুমি কি খেপে গেলে ফ্লুটবালা?

হ্যাঁ, খেপেই গেলাম—স্টার্ট।

খানিকক্ষণ জোরজার করতে সেই গানটা গোটা গেয়ে ফেলল মেরি। ফিল্মেরই গান ওটা—স্নিগ্ধ প্রেমের গান। রেকর্ডে রেডিওতে আগেও গানটা শুনেছে জোহন। কিন্তু ফিল্মে যে প্লে-ব্যাক করেছিল, তার চাইতে ঢের ভালো গাইল মেরি। প্লে-ব্যাকে প্রচুর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু খালি গলায় গেয়ে তার চাইতে অনেক বেশি এফেক্ট এনে দিয়েছে মেরি।

চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিল জোহন। তার সমস্ত স্নায়ুর ওপর দিয়ে প্রথম বর্ষার বৃষ্টিপাতের মতো রিম-ঝিম করে কী বেজে যাচ্ছিল। গান থামলে চোখ মেলে সে বলল, ফাস্ট ক্লাস!

মেরি একটু হাসল।

জোহন বলল, আর একটা হোক।

মেরি এবার আপত্তি করল না। তার সংকোচ বা লজ্জা অনেকটাই কেটে গেছে। মেরির দ্বিতীয় গানটাও ফিল্মের গান এবং প্রেমেরও। এটাও দারুণ গাইল সে; চড়ায় এবং খাদে দু-জায়গাতেই তার গলায় সমান কারুকাজ।

দ্বিতীয় গানটি শোনার পর জোহন বলল, কামাল করে দিয়েছ ছোকরি।

প্রশংসার কথাটা ভালো লাগল মেরির। এবারও সে হাসল, কিছু বলল না। জোহন আবার বলল, তুমি কার কাছে গান শিখেছ?

মেরি বিষাদের সঙ্গে কৌতুকের বাজ মিশিয়ে বলল, 'ভালো কথাই বলছ! খেতে পেতাম না, তার ওপর আবার গান শিখবা! যেটুকু শিখেছি রেডিও কি মাইকে রেকর্ড বাজানো শুনে।' বলতে-বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল মেরির। ঈষৎ গলা চড়িয়ে দিল সে, 'ও ভালো কথা—'

কী?

বছর কয়েক আগে ইউ-পির এক পয়সাওলা ঘরের রাইস ছোকরা ব্যান্ড স্ট্যান্ডে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে আমাকে রেখেছিল। ছোকরার গান-বাজনার ঝোঁক ছিল; আর্টিস্টিক মেজাজ। আমার গান শুনে দুম করে একটা গানের মাস্টার রেখে দিয়েছিল; সঙ্গে একটা তবলচি। গদগদ হয়ে সব সময় সে বলত, আমাকে লতা মঙ্গেশকর বানিয়ে ছাড়বে। তখন কিছুদিন গানের তালিম নিয়েছিলাম।

তারপর—

তারপর আর কী। আমি তো তখন সুখের বাতাসে ডানা মেলে উড়ছি। কিন্তু ডানাটা একদিন আচমকা বিনা নোটিশেই কাটা গেল; আর আমি ঝুপ করে আবার ব্যান্ড স্ট্যান্ডের ষোলো--তলা বাড়ির মাথা থেকে যে ফুটপাথে ছিলাম, হাড়গোড় ভেঙে সেই ফুটপাথেই এসে পড়লাম।

তার মানে?

তার মানে হল, কীভাবে খোঁজখবর করে ছোকরার বাপ ইউ-পি থেকে ব্যান্ড স্ট্যান্ডের সেই অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির। তখন গানের জমজমাট আসর চলছে। সেই ছোকরার বাপ ওখানকার এক বড় বিজনেস ম্যান, বিরাট পাকানো গোঁফ, বাঘের মতো চোখ, ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, প্রায় সাত ফুট লম্বা-আমার চুলের ঝুঁটি ধরে পেছনে তিনটে লাথি মেরে বাইরে বের করে দিল। তারপর তবলচি আর গানের মাস্টার লাথি খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। সেদিন আবার লিফট কী একটা গোলমাল ছিল; আমরা তিনজন প্রসেশান করে ষোলো—তলা থেকে নীচে নেমে এলাম।' বলতে-বলতে একটু থামল মেরি। এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে তার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। দম নিয়ে সে আবার বলল, 'সেই আমার প্রথম আর শেষ গান শেখা।'

জোহন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বলল, 'দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো।'

মেরি উত্তর দিল না।

একটু চিন্তা করে জোহন এবার জিগ্যেস করল, কোনও মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন ধরো সেতার, সরোদ, ভায়োলিন-এই সব বাজাতে পারো?

মেরি বলল, ব্যান্ড-স্ট্যান্ডে থাকার সময় ওই তিনমাসে হরমোনিয়াম বাজাতে শিখেছিলাম।

ওতেই হবে।

কী হবে?

দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী জোহন আজও বাইরের বারান্দায় শুয়েছে, মেরি শুয়েছে ঘরে।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরও ঘুম আসছিল না জোহনের। মেরির সেই দুটো গানের আশ্চর্য সুর তার রক্তের মধ্যে, স্নায়ুর মধ্যে এখনও বেজে যাচ্ছে। সে গান-বাজনার লোক। যদিও সাদাসিধে। ভোলাভালা বাউণ্ডুলে এবং শরাবি, জগতের সব ব্যাপারেই উদাসীন, নির্লিপ্ত, তবু তার মনে হচ্ছিল মেরির গলাটা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। এমন সুরেলা কণ্ঠস্বর হাজারে একটি মিলবে কি না সন্দেহ। এপাশি-ওপাশ করতে-করতে হঠাৎ জোহন ডাকল,

'মেরি—'

সাড়া পাওয়া গেল না।

জোহন আবার ডাকল, এই মেরি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

এবার ঘুমজড়ানো গলায় মেরি জবাব দিল, কী বলছি?

তোমার ব্যাপারে একটা কিছু করা দরকার।

কী করবে?

অলমাইটি তোমার গলায় এমন খুশবু ঢেলে দিয়েছে। ঝোপড়াপট্টিতে পড়ে থেকে ওটা নষ্ট হয়ে যাক— এ আমি চাই না।

কী চাও তা হলে?

হোল ওয়ার্ল্ড তোমার গান শুনুক।

মেরি এবার বলল, মাথায় বুঝি পোকা কামড়াচ্ছে। অনেক রাত হল, এবার চুপচাপ ঘুমিয়ে পড় তো। বেশি রাত জাগলে শরীর আবার খারাপ হবে।

জোহান অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, হচ্ছে একটা কাজের কথা। তার ভেতর ঘুম এনে ঢোকাতে বলেছো কে? আরে বাবা হোল লাইফ, ঘুম তো আছেই, কিন্তু কাজের কথাটা তো বসে থাকবে না।

আচ্ছা, কী বলতে চাইছ বলো।

'তোমার গান রেকর্ডে রেডিওতে সবসময় বাজবে, এটা আমি দেখতে চাই।' শব্দ করে হোসে উঠিল মেরি।

জোহান রেগে উঠল, হাসলে যে! এটা কি হাসির কথা হল?

হল না।

কেন হল, সেটা মেহেরবানি করে বুঝিয়ে দাও দিকি।

আরে বাবা, তুমি হলে ব্যান্ডপার্টির ফ্লুটবালা, আর আমি হলাম দশ টাকা মজুরির এক বেশ্যা। দু-জনে দশ জন্ম চেষ্টা করলেও আমার গান রেডিও কি রেকর্ডে বাজবে না। স্বপ্ন-টপ্ন একটুআধটু আমিও দেখতাম; তাই বলে তুমি হাওয়ায় এয়ার ইন্ডিয়া বিল্ডিংয়ের মতো একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলবে?

এবার উত্তেজিতভাবে উঠে বসল জোহন। ঘরের দরজাটা ভেজানো থাকে। যদিও সে মেরিকে ওটা বন্ধ করে খিল আটকে শুতে বলেছে, মেরি তা করে না। মেরির মনোভাব এইরকম—পুরুষমানুষকে তার ভয় নেই; দেহের ক্ষতি যেটুকু হবার তা আগেই হয়ে গেছে। তবে জোহনের মনোভাবটা এইরকম-শরীর বলে কথা। কখন কোনও উত্তেজনার মুহূর্তে সে ঘরে ঢুকে পড়বে। তারপর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাক আর কি। অবশ্য তেমন দুর্ঘটনা এখনও ঘটেনি। এখন উত্তেজিত হয়েই আছে জোহন; তবে সে উত্তেজনাটা অন্যরকম।

যাই হোক, ঝড়াং করে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে ফেলল জোহন। বলল, 'তোমাকে নিয়ে আমি চারদিক তোলপাড় করে ফেলব-দেখি কিছু হয় কি না। ওয়ার্ল্ডটা এখনও বিলকুল বুরা (খারাপ) হয়ে যায়নি; সাচ্চা জিনিসের দাম চেষ্টা করলে আজও পাওয়া যায়।'

আলো জ্বালাতেই মেরি দ্রুত উঠে বসেছিল। কয়েক পলক জোহনের দিকে তাকিয়ে থেকে গলার স্বরে মজা এবং বিদ্রুপ মিলিয়ে বলল, তাই নাকি?

ইয়েস। তার আগে তোমাকে তালিম নিয়ে তৈরি হতে হবে।

কে তালিম দেবো?

'সেটা কাল বলব।' আলো নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল জোহন।

কথামতো পরের দিন সকালে হাবিব আবার এল। আসামাত্র জোহন তাকে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে চলে গেল। ঝোপড়পট্টির কাচাবাচ্চারা আজও বাজনা শোনার বায়না ধরেছিল; জোহন তাদের সঙ্গে নেয়নি। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঝোপড়াপট্টিতেই রেখে গেছে।

দুপুর পর্যন্ত তালিম দিয়ে দুটো গত্ হাবিবকে মোটামুটি শেখাতে পারল জোহন। তারপর ঝোপড়াপট্টিতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বলল, 'আজ আর ওবেলা শেখাচ্ছি না;

তুই এখন ভেন্ডিবাজারে ফিরে যা।'

আসলে মেরির চিন্তাটাই তার মাথার ভেতর কাল থেকে আটকে আছে। নেহাত হাবিবকে কথা দিয়েছে তালিম দেবে, তাই শেখানো। তা ছাড়া ছোকরা দারুণ আশা করে আছে-ক্ল্যারিওনেট বাজাতে শেখাটা তার কাছে বঁচা-মিরার প্রশ্ন। ওটা তাকে শেখাতেই হবে। জোহন ঠিক করে নিয়েছে, যে ক'দিন ঘরে পড়ে আছে সকালের দিকটা হাবিবকে তালিম দেবে। আর দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুমের কয়েক ঘণ্টা বাদ দিলে, বাকি যে সময় থাকে, সে সময়টা মেরির পেছনে লেগে থাকবে।

হাবিব চলে যাবার পর জোহন মেরিকে বলল, নাও, শুরু করো।

একটু অবাক হয়েই মেরি জিগ্যেস করল, কী?

কী আবার-গান। কাল রাত্তিরে তোমার সঙ্গে সেই কথাই তো হল। সূর্যটা আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে-বেয়ে এখন সোজা বম্বে শহরের মাথার ওপর এসে উঠেছে। জুন মাসের এই গোড়ার দিকটায় রোদের তেজ সাংঘাতিক; চারদিক ঝলসে যাচ্ছে। সকালে সমুদ্রের দিক থেকে উলটো-পালটা ঝোড়ো হাওয়া ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়াটা পড়ে গেছে। অসহ্য গুমোটে ঝোপড়াপট্টির এই ঘরে বসে গলগল করে ঘামতে-ঘামতে কেউ যে গান গাইবার কথা বলতে পারে, শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না মেরি। সে বলল, এই গরমে গান গাইবো তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

এই ঝলসে-যাওয়া দুপুরে মেরিকে দিয়ে কিছুতেই গান গাওয়ানো গেল না। কিন্তু বিকেলে তাকে ছাড়ল না জোহন। দু-চারটে গান শোনার পর সে বুঝতে পারল এ-সবই ফিল্মের গান। রেকর্ড কিংবা রেডিওর বিবিধ ভারতীতে শুনে-শুনে গলায় তুলে নিয়েছে মেরি। কিন্তু অন্যের গান নকল করে তো নাম করা যাবে না। নকলনবিশকে কে আর শিল্পীর সম্মান দেয়, তার জন্য নিজস্ব কিছু দরকার। এই কথাগুলো ঠিক এইভাবে ভাবেনি জোহন, তার নিজের মতো করে নিজের নিয়মে ভেবেছে। সে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, যে-কোনও গান শুনলে তুমি গলায় তুলে নিতে পারো?

মেরি ঘাড় হেলিয়ে দিল, অর্থাৎ পারে। তারপর বলল, হারমোনিয়াম পেলে গানটা বাজাতেও পারি।

'ভেরি গুড। একটা হারমেনিয়াম শিগগিরই জোগাড় করে ফেলছি।' একটু চুপ করে থেকে কী ভাবল জোহন। তারপর বলল, 'লিখতে পড়তে পারো?'

'একটু-আধটু পারি। এক সময় অরফ্যানেজে ছিলাম, সেখানে টু-থ্রি স্টান্ডার্ড পর্যন্ত পড়েছি।' জোহনের চোখ শ্রদ্ধায় এবং খুশিতে চকচকিয়ে উঠল, 'আরে, তুমি তো দারুণ বিদ্বান দেখছি। আমার পেটে আস্ত একখানা ড্যাগার চালিয়ে দিলেও এ-বি-সি-ডি'র পর আর কিছু বেরুবে না।'

মেরি হেসে ফেলল। জোহন আবার বলল, কাগজ আর ডট পেন নাও!

মেরি কাগজ-কলম নিয়ে বসল। খুব ছেলেবেলায় অর্থাৎ বাপ মারা যাবার পর জোহন যখন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, তখন প্রায়ই তার চোখে পড়ত ইউ-পি থেকে, এম-পি থেকে, রাজস্থান কি গুজরাট থেকে নানা গান-বাজনার দল বম্বে সিটিতে এসে হাজির হতো। সেই সব দলে মেয়ে এবং পুরুষ দুই-ই থাকত। আজাদ ময়দান, ক্রস ময়দান কিংবা ওভাল অথবা গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে রাস্তার ধারে ওরা রাত কাটাত। আর দিনের বেলাটা দলবল নিয়ে মেরিন ড্রাইভ, চৌপট্টি, বড়ীবন্দর কিংবা ভেন্ডিবাজারে, যখন যেখানে সুবিধা গানের আসর বসিয়ে দিত। ওরা ফিল্মটিল্মের গান গাইত না; তখনকার দিনে ফিল্মের এত হুজুগও ওঠেনি। ওরা ওদের নিজেদের বাঁধা গান নিজেরাই সুর দিয়ে গাইত। কিছুদিন ওই সব দলে ভিড়ে গিয়েছিল জোহন। অবশ্য এক দলে সে বেশিদিন থাকত না। দশ দিন হয়তো এ দলে, পনেরো দিন ওই দলে—'এই করে করেই কেটে যেত। সেই ছেলেবেলা থেকেই স্মৃতিশক্তিটা তার ভালো। একবার যা শুনত, তা আর ভুলত না। সুর বোঝার মতো কান ছিল জোহনের, গানের দলগুলোর সঙ্গে ঘুরতে -ঘুরতে প্রচুর গান এবং সেই সব গানের

সুর মনে করে রেখেছিল সে, পরে ক্ল্যারিওনেট বাজাতে শিখে সুরগুলো তুলে নিয়েছিল। এখনও সেই--সেই গানগুলো এবং তাদের সুর তার স্পষ্ট মনে আছে। জোহন বলল, 'লেখো- ও পুরবৈঁয়া মাত যা, মাত যা—'

এই গানটা তার সবচাইতে প্রিয়। প্রিয় গানটা দিয়েই সে শুরু করল। তারপর আরও তিনচারটে গানের কথা বলে গেল।

গানগুলো লিখে নেবার পর জোহন বলল, 'আমি তো আর গেয়ে শোনাতে পারব না; হাঁ করলে আমার গলা থেকে আঠারো রকমের আওয়াজ এক সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। ফ্লুটে সুরগুলো বাজাচ্ছি, গানের কথাগুলো দেখে গানগুলো গলায় তুলে নাও—' বলেই প্রথম গানটার সুর আস্তেআস্তে ক্ল্যারিওনেট বাজাতে লাগল।

খুব মন দিয়ে সুরাটা শুনল মেরি। তারপর বার দুই তিন জোহনের ক্ল্যারিওনেটের সঙ্গে গেয়ে সুরাটা তুলে ফেলল। শুধু একটা নয়, পর পর চারটে গানই তুলল; এবং জোহনের সাহায্য ছাড়া একা গেয়ে শুনিয়েও দিল।

জোহন খুশিতে কী যে করবে, প্রথমটা ভেবে পেল না। পরক্ষণেই প্রায় ছোঁ মেরে মেরিকে কাঁধে তুলে এক চক্কর ঘুরিয়ে বলল, 'তুন কামাল কর দিয়া, কমপ্লিট কামাল কর দিয়া—'

ঘুরপাক খেতে-খেতে মেরি চেঁচাতে লাগল, 'ছাড়ে-ছাড়ো, পড়লে হাড় গোড় ভেঙে যাবে।'

মেরিকে নামিয়ে দিয়ে জোহন বলল, একদিনে পাঁচটা গান তুলেছি, দেখেশুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মাথাটা তুমি বিলকুল ঘুরিয়ে দিয়েছ।

পরের দিন থেকে সকালে হাবিবকে তালিম দিয়ে বিকেল থেকে মেরিকে নিয়ে পড়ল জোহন। এবং চোদ্দো দিনে ইউ পি, এম পি-র সেই পরিচয়হীন ভবঘুরে গানের দলগুলোর কাছ থেকে যত গান মনে করে রেখেছিল, সব মেরিকে শিখিয়ে দিল।

পুরো একুশ দিন বাদে ডাক্তার গিল্ডারের কাছ থেকে আবার ব্যান্ডপার্টিতে বাজাবার অনুমতি পাওয়া গেল। এখন জুনের মাঝামাঝি। আরব সাগর পাড়ি দিয়ে বম্বে সিটিতে বরষা এসে গেছে। প্রায়ই ঝেঁপে-ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে। আকাশ জুড়ে চাংড়া-চাংড়া জলবাহী ভারী মেঘ অনড় হয়ে আছে। এ-সময়টা ব্যান্ডওলাদের পক্ষে অফ সিজন অর্থাৎ ব্যাবসাপত্র খুবই মন্দা চলছে। এখন কচিৎ কখনও এক-আধটা বায়না আসে। যা-ও আসছে, বর্ষাটা পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে তা-ও আসবে না। জোহন এবং আর দু-চারজন বাজিয়ে ছাড়া বাদবাকিদের পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই ছাড়িয়ে দেবে ইফতিকার সাহেব। সেদিকে এখন আর মন নেই জোহনের। মেরিকে নতুন গান-টান কী শেখানো যায়, সেই চিন্তাটাই সর্বক্ষণ তাকে পেয়ে বসেছে। অবশ্য এ-নিয়ে অনেক ভেবেছে সে এবং কিছু কিছু উপায়ও ঠিক করে ফেলেছে।

এর মধ্যে মেরিকে ইনস্টলমেন্টে একটা হরমোনিয়াম কিনে দিয়েছে জোহন। আর যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে, সেই দিনগুলো বাদে অন্য দিনগুলো নতুন গানের জন্য গোটা বম্বে শহর চষে বেড়ায় সে। কোথাও গানের আসর বসেছে। খবর পেলেই হল। সময় পেলে মেরিকে সঙ্গে নিয়েই সেখানে চলে যায়; নইলে একাই ছোটে। অবশ্য কোনও আসরেই তারা ঢুকতে পায় না। তার মতো ব্যান্ডপার্টির এক ফ্লুটবলার পক্ষে টিকিট কেটে গানের আসরে ঢোকা সম্ভব নয়। তবে সব আসরেই মাইক টাইক লাগানো থাকে। যারা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে পারে না, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। এর জন্য আসরের উদ্যোক্তাদের মনে-মনে হাজারবার ধন্যবাদ দেয় জোহন। যেদিন সে একলা আসে বাইরে কোনও নির্জন কোণে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে খাপ থেকে ক্ল্যারিওনেটখানা বার করে আস্তে-আস্তে বাজিয়ে গানটা তুলে নেয়। তারপর ঝোপড়পট্টিতে ফিরে মেরিকে শিখিয়ে দেয়। যেদিন মেরিকে সঙ্গে আনে, সেদিন আসরের গায়ক বা গায়িকার সঙ্গে নীচু গলায় গেয়ে-গেয়ে গানটা তুলে নিতে বলে।

নতুন গানের সন্ধানে শুধু আসরে-আসরেই ঘুরে বেড়ায় না জোহন। বম্বে শহরে

এখনও ভবঘুরে গানের দল ইউ পি, এম পি বা রাজস্থান থেকে এসে হাজির হয়। রাস্তা, ময়দান বা বাহাত্তর ইঞ্চি জলের পাইপের ভেতর থেকে তাদের খুঁজে-খুঁজে বার করে গান তুলে আনে। তা ছাড়া তাদের আনারকলি ব্যান্ডপার্টিতে হরিয়ানার একটা বাজনাদার আছে। জোহনেরই সমবয়সি হবে, নাম শৈলেন্দ্র। দলে সে সাইড ড্রাম বাজায়। শৈলেন্দ্রর একটা বড় গুণ, সে ভালো গান লিখতে পারে। তার খাতা থেকে গাদা-গাদা গান লিখিয়ে এনে, মেরি আর সে দুজনে মিলে সুর দিয়ে নিয়েছে। এতেও খুশি না জোহন। মেরির জন্য আরও-আরও আরও নতুন ধরনের, নতুন মেজাজের গান তার চাই। তারই খোঁজে সে আরও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। একদিন এই নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

জোহন খবর পেয়েছিল বম্বের এক ক্রোড়পতি বিজনেসম্যান পালি হিলের এক বাংলো বাড়িতে লক্ষ্ণৌয়ের এক খুবসুরত বাঈজিকে এনে রেখেছে। সন্ধ্যায় সেখানে গজল আর ঠুংরি গানের আসর বসে। শোনামাত্র জোহান আর দেরি করল না। ক্ল্যারিওনেটের বাক্সটি কাঁধে চাপিয়ে সেখানে হানা দিল। বিরাট কম্পাউন্ডওলা বাংলোটার চারধারে খাড়া পাঁচিল। লোহার ফটকে রাইফেল ঘাড়ে সাত ফুট লম্বা, ইয়া চওড়া, গালে গালপাট্টা এক রাজপুত দারোয়ান খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং সুপ্রিয় ঢোকার কোনও আশাই নেই। এদিকে বাইরে থেকে টের পাওয়া যাচ্ছিল, ভেতরে আসর জমে উঠেছে।

অস্থিরভাবে বাড়িটার চারপাশে বার দুই চক্কর দিল জোহন। তারপর ফটকটা যেদিকে, তার উল্টোদিকের কম্পাউন্ড-ওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাংলোটা একতলা, ওপরে টালির ছাদ। সামনের দিকের একটা গোটা ঘরের সবটুকু মেঝে জুড়ে লাল গালিচা পাতা। তার মাঝখানে চৌধবি কি চাঁদের মতো বসে লক্ষ্ণৌবালী বাঈজি একটা চটকদার ঠংরি গাইছিল। তার দু-ধারে দুই সারেঙ্গিদার আর তবলচি। বাঈজির সামনে ক্রোড়পতি ব্যাবসাদার আর তার দু-চারজন বন্ধুবান্ধব; সবারই হাতে হুইস্কির গেলাস।

বাইরে কেয়ারি করা ফুলের বাগান, চমৎকার লন, পাম আর ঝাউ গাছ, নানারকম আর্কিড আর দুষ্প্রাপ্য ক্যাকটাস।

একটা বড় সিলভার পামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভেতরে একবার উঁকি দিল জোহন। তার পক্ষে বাঁচোয়া, বাইরের লনে বা বাগানে এখন আলো-টালো জ্বলছে না।

দারুণ গাইছে বাঈজি। গলায় আতশবাজির ফুলকি না কি খুসবুওলা রক্তগোলাপ ফুটিয়ে যাচ্ছে সে। সম্মোহিতের মতো ক্ল্যারিওনেটটা বার করে আস্তে-আস্তে বাজিয়ে গান এবং সুর তুলতে লাগল জোহন। তুলতে-তুলতে এমন বুদ হয়ে গেল যে, কোথায় কীভাবে এসে ঢুকেছে। সব বেমালুম ভুলে গেল। প্রায় নাচের ভঙ্গিতে দুলে-দুলে এবং বেশ - জোরে-জোরেই বাজাতে লাগল সে।

জোহনের ক্ল্যারিওনেটের বাজনা বোধহয় ভেতরের লোকেরা শুনতে পেয়েছিল। কেউ একজন ভারী মোটা জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কৌন রে—

নেশাচ্ছন্নের মতো বাজিয়ে যাচ্ছিল জোহন। মুখ থেকে ক্ল্যারিওনেটটা নামিয়ে সে বলল, 'ম্যায়-জোহন ফুলুটবালা। বাহ, ক্যা সঙ্গীত! ওয়ান্ডারফুল!' বলেই ক্ল্যারিওনেটটা তুলে আবার বাজাতে শুরু করল।

পাঁচ সেকেন্ডও কাটল না, বাইরের লনে বাগানে পাঁচশো ওয়াটের দশ-বারোটা আলো পটাপট জ্বলে উঠে জোহনের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। পরক্ষণেই অনেক লোকের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। দেখা গেল, বিজনেসম্যান এবং তার বন্ধুরা টলতে-টলতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তারা চেঁচাচ্ছিল, 'এ শুয়ারকা বাচ্চা, কোন তু? এ দারোয়ান চোট্টা ঘুষা। পাকড়ো শালেকো, সন অফ বিচ্‌কো। ফায়ারশুটু হিম—

ওধার থেকে সাত ফুট লম্বা রাজপুত দারোয়ান রাইফেল উঁচিয়ে হই-হাঁই করতে-করতে ছুটে আসছে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি ঘেয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল জোহনের। ক্ল্যারিওনেটটা

আর খাপে পোরার সময় পাওয়া গেল না; কোনওরকমে সে দুটো কাঁধে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ফুলবাগান মাড়িয়ে অর্কিডের মাথা গুড়িয়ে পেছন দিকে ছুটল; তারপর পাঁচিল টপকে বাইরের রাস্তায়। রাস্তায় নেমেও সে থামল না। প্রায় মাইলখানেক দৌড়ে সমুদ্রের ধারে এসে জলের কাছাকাছি একটা উঁচু ঢিবির ওপর বসে আধঘণ্টা হাঁপাল। তারপর পুরো ঘটনাটা আগাগোড়া একবার ভেবে নিয়ে খুব একচোট হাসল।

জুনের মাঝামাঝি থেকে গোটা আগস্ট মাস অর্থাৎ বম্বে শহরে বর্ষার আয়ু মোট আড়াই মাস। দেখতে-দেখতে এ বছরের মতো এ-শহর থেকে বর্ষা বিদায় নিল। এই আড়াই মাসে কয়েক শো গান শিখেছে মেরি। আর বর্ষা কাটবার পর আবার ব্যান্ডপার্টিগুলোর নতুন মরশুম শুরু হয়েছে। দুটো একটা করে বায়না আসছে। তার মানে মেরির গান-টানের ব্যাপারে এখন রোজ সময় দিতে পারছে না জোহন।

একদিন কল্যাণে জোহানদের দল বাজাতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঝোপড়াপট্টিতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি সে বাইরের বারান্দায় শুয়েছে, মেরি শুয়েছে ঘরের ভেতরে।

রোজই ঘুমিয়ে পড়ার আগে দুজনে দু-জায়গায় শুয়ে কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে। ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে বাজাতে বেরিয়ে কোথায় তারা গিয়েছিল, সারাদিনে কী-কী ঘটেছিল, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে সব মেরিকে বলে জোহন।

আজ কল্যাণের যাবতীয় ঘটনা বলে যাচ্ছিল জোহন। সেখানে এক মাড়োয়ারি শেঠের নাতনির জন্মদিনে তারা বাজাতে গিয়েছিল। সেখানে কী-কী মজাদার ঘটনা ঘটেছে, তার ফিরিস্তি দিতে-দিতে হঠাৎ তার মনে হল মেরি বোধহয় শুনছে না। একটু থেমে সে বলল, কি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

মেরি উত্তর দিল না। আরও দু-চারবার ডাকাডাকির পর মেরির যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন চুপ করে গেল জোহন। পাক্কা বারো ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তার চোখ বুজে আসছিল। নেহাত সারাদিনের ঘটনা মেরি জানতে চায় বলেই সে বলে যাচ্ছিল। এখন মেরিই ঘুমিয়ে পড়েছে; কাকে আর বলবে।

ঘুমটা যখন প্রায় গাঢ় হয়ে এসেছে, সেইসময় কানের কাছে অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেল জোহন, এই ফ্লুটবালা, ঘুমেলে নাকি?

ধড়মড় করে উঠে বসিল জোহন। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে জড়ানো গলায় কিছুটা উদ্বেগ মিশিয়ে বলল, কী হয়েছে?

কিছু হয়নি।

প্রায় তিন মাসের মতো এই ঝোপড়পট্টিতে তার এই ঘরখানায় আছে মেরি। একটা পলকা ভেজানো দরজার এধারে ওধারে দুজনে শুয়ে থাকে। কিন্তু কোনওদিনই দরজা খুলে রাত্রিবেলা বেরিয়ে আসেনি মেরি। আজ কী হয়েছে তার? বিমূঢ়ের মতো জোহন জিগ্যেস করল, তা হলে?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেরি। তারপর বলল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

বলো। তার আগে আলোটা জ্বেলে দাও।

আলো জ্বাললে বলতে পারব না।

হতভাম্বের মতো জোহন এবার জিগ্যেস করল, কী এমন কথা যে আলোতে বলা যায় না?

আবার খানিকক্ষণ চুপ। তারপর মেরি বলল, তোমার কাছে অনেকদিন থেকে গেলাম। ভেবেছিলাম, তুমি ভালো হয়ে গেলে চলে যাব। কিন্তু গান-টান শিখতে-শিখতে যাবার কথা মনে ছিল না। এখন আমি কী করব?

কী আবার করবে, আমি কি তোমাকে যেতে বলেছি!

কিন্তু আমাব এভাবে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

তবে কীভাবে থাকতে চাও?

বলতে সাহস হচ্ছে না?

হঠাৎ জোহনের মনে পড়ল, এই আড়াই মাসে গান শেখাবার ফাঁকে-ফাঁকে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে থেকেছে মেরি এবং কী যেন বলতে চেয়েছে। তখন খেয়াল করেনি জোহন। সে বলল, আমি আবার একটা মানুষ! আমাকে যা ইচ্ছে বলা যায়।

তুমি তো শুনেছ। আমি খুব খারাপ। তবু মেয়েই তো; আমার কি কোনও সাধ-টাধ থাকতে নেই?

বুঝতে না পেরে অন্ধকারে অবাক তাকিয়ে রইল জোহন।

মেরি যেন ঘোরের মধ্যে বলে যেতে লাগল, এতগুলো বছর চোর-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার এখানে আসার পর দিনের পর দিন ভাবছি, অন্য মেয়েদের মতো আমারও তো ঘর-সংসার হতে পারে। আমার মতো একটা নোংরা গান্ধা মেয়েকে তুমি বাঁচাবে ফুলুটবালা?

জোহন অন্ধকারেই তার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, তুমি কি বিয়ের কথা বলছ?

আচমকা একরোখা জেদী পোড়-খাওয়া মেরি জোহনের বুকে মুখটা ঘষতে-ঘষতে ফুপিয়ে উঠল, হাঁ—হাঁ—হাঁ—

জোহনের কাছে এসে যে মমতা, যে নিরাপত্তা সে পেয়েছে, তা আর ছেড়ে যেতে চায় না। বহুকাল অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর তার সাধ আর ইচ্ছা বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছে।

জোহন হকচাকিয়ে গেল। সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বছরের জীবনে কোনও যুবতী মেয়ে তাকে এ-জাতীয় কথা কখনও বলেনি। প্রথম চমকটা কেটে যাবার পর, জলোচ্ছাসের মতো দুরন্ত এক আবেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল যেন। সে বলল, কিন্তু আমি একটা ওল্ড ম্যান, চুল দাড়িতে পাক ধরে গেছে। ক'দিনই বা বাঁচব।

হাত দিয়ে জোহনের মুখটা চেপে মেরি বলল, ওসব কথা বলতে হবে না; ওল্ড ম্যানই আমার ভালো। তুমি যদি বিয়ে না করো বুঝব আমি খারাপ মেয়ে বলে তুমি আমাকে নফরত (ঘেন্না) করছ।

আরো না-না ! তোমাকে আমি নফরত করব! কী বলছ মেরি! জখম হয়ে আসার পর আমার জন্যে তুমি যা করেছ, কেউ কখনও তা করেনি। কিন্তু আমি যে অন্য কথা ভাবছিলাম—

কিছু ভাবতে হবে না। আগে আমাকে কথা দাও।

জোহন বার-বার বোঝাতে চেষ্টা করে সে বুড়ো মানুষ, জীবনের লম্বা দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছে, মেরির মতো একটা টাটকা তাজা কলাকার মেয়ের উচিত হবে না তার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া। তাকে বিয়ে করা মানে জীবনটাকে ডাহা নষ্ট করা। জোহনই একটা ভালো রোজগেরে যুবক খুঁজে পেতে মেরির বিয়ে দেবে। ঝোঁকের মাথায় কোনও কাজ করা ঠিক না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। মেরি ক্রমাগত জোহনের বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলে যেতে লাগল, কথা দাও, আগে কথা দাও।

জোহন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। নিজের দীর্ঘ নারীসঙ্গহীন জীবনের সমস্ত উদাসীনতা দিয়ে একটা একরোখা দুঃখী মেয়ের প্রবল ইচ্ছা আর জেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে-করে একসময় হেরে গেল সে। হাল ছেড়ে দেবার মতো করে বলল, ঠিক আছে, কথা দিলাম। পরে কিন্তু তোমাকে আপশোশ করতে হবে। আর একটা কথা—

কী?

বিয়েটা কিন্তু এখন হবে না।

বুকের ভেতর থেকে মুখটা বার করে এনে উৎকণ্ঠিতের মতো তাকাল মেরি। জোরে শ্বাস টেনে বলল, কবে হবে?

জেহন বলল, এত গান শিখলে, এখনও তো অনেক কাজ বাকি।

কী কাজ?

তুমি যে এত ভালো গাও, সেটা তো শুধু আমি একলা জানি। হোল ওয়ার্ল্ডকে তা জানাতে হবে না? বিয়ে-ফিয়ের চক্করে এখনই ফেঁসে গেলে এতদিনের এত খাটুনি সব জলে যাবে।

কী করতে চাও তুমি?

এখনও ভেবে উঠতে পারিনি। দেখি কিছু একটা প্ল্যান এসে যাবে। যাও, অনেক রাত হয়েছে, এখন শুয়ে পড়ো গিয়ে।

মেরির ভাবনাটা ক'দিন ধরে অস্থির করে রেখেছে জোহনকে। ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়াপট্টিতে ঘাট স্কোয়ার ফুটের একটা ঝোপড়িতে ওইরকম চমৎকার একটা গানের গলা নষ্ট হয়ে যাবে, কিছুতেহ সে এটা মেনে নিতে পারছিল না। এই আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠস্বরটিকে সারা ইন্ডিয়ার ঘরে-ঘরে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত, কোনও কিছুতেই জোহন আরাম বোধ করছিল না। কিন্তু তার মতো ব্যান্ডপার্টির এক নগণ্য ফ্লুটবালার পক্ষে কতটুকু কী করাই বা সম্ভব! ভাবতে-ভাবতে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো পাটিল সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র ইফতিকার সাহেবের দৌলতে তার সঙ্গে জোহনের আলাপ হয়েছে। পাটিল সাহেব একটা রাজনৈতিক দলের লিডার স্থানীয় লোক; বড়-বড় জায়গায় তার যাতায়াত; অনেক মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগাযোগ। জোহনকে তিনি ভালেই চেনেন; বহুবার তার বাজনার তারিফ করেছেন।

মনে-মনে সঠিকভাবে একটা কিছু ভেবে প্রভাদেবীতে পাটিল সাহেবের বাড়ি গিয়ে হাজির হল জোহন। পাটিল সাহেব বাড়িতেই ছিলেন এবং মেজাজটাও তার তখন বেশ ভালেই মনে হচ্ছিল। তবে জোহনের বেশ ভয় হচ্ছিল পাটিল সাহেব এখন তাকে চিনতে পারবেন কি না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জোহন জেনেছে অনেকে বাইরে একরকম, বাড়িতে আরেক রকম। বাইরে হেসে-হেসে কথা বললেও বাড়িতে গেলে বিরক্ত হন। সেই কারণে তার বুকটা টিবটিব করছিল।

কিন্তু জোহনের ভয়ের কোনও কারণ পাটিল সাহেবের ক্ষেত্রে অন্তত ছিল না। দেখামাত্রই তিনি তাকে চিনতে পারলেন এবং একটু অবাকও হলেন। জোহন যে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত আসতে পারে, এটা বোধহয় কখনও তিনি ভাবেননি।

যাই হোক হাসিমুখেই পাটিল সাহেব বললেন,"আরো জোহন যে! আয়-আয়, বোস।

পাটিল সাহেব তার বসবার ঘরে একটা সোফায় বসেছিলেন। জোহন মেঝেতে পাটের তৈরি কার্পেটের ওপর বসল।

পাটিল সাহেব এবার বললেন, শুনেছিলাম ইলেকশনের রেজাল্ট বেরুবার দিন পাথরের ঘায়ে তুই জখম হয়েছিল। এখন কেমন আছিস?

ভালো।

আমার কাছে কিছু দরকার আছে?

জি।

বলে ফ্যাল।

মেরিকে নিজের রিস্তাদার অর্থাৎ আত্মীয় এই পরিচয় দিয়ে, জোহন সংক্ষেপে তার গানের গলা সম্বন্ধে দশগুণ রং চড়িয়ে উচ্ছসিতভাবে বলে গেল। এই ভূমিকাটুকু করে সেই সঙ্গে যা জুড়ে দিল, তা এইরকম—তারা নেহাতই গরিব মানুষ, ভেরি পুওর পিপল। সে কারণে মেরি কোথাও কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। এখন মেহেরবানি করে পাটিল সাহেব যদি

একটা সুযোগ করে দেন তো, তারা চিরদিন তার গোলাম হয়ে থাকবে। এই জন্যেই সে তাকে বিরক্ত করতে এসেছে।

সব শুনে পাটিল সাহেব বললেন, কিন্তু তুই তো জনিস। আমি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, পার্টিটার্টি করে বেড়াই। গান-বাজনার ব্যাপার কিছুই জানি না।

আপনার সঙ্গে তো অনেকের আলাপ। মেহেরবানি করে যদি কোনও রেকর্ড কোম্পানি কি সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টরকে বলে দ্যান। একটা চান্স পেলে মেরি কামাল করে দেবে।

রেকর্ড কোম্পানি বা ফিল্মের মিউজিক ডিরেক্টর-কারও সঙ্গেই তো আমার জানাশোনা নেই রে।

অনেক আশা নিয়ে পাটিল সাহেবের কাছে ছুটে এসেছিল জোহন। তাঁর কথায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করল সে। হতাশ সুরে বলল, তা হলে?

পাটিল সাহেব উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। আচমকা কী মনে পড়তে একটু থেমে বললেন, 'এক কাজ কর না—'

জোহান উৎসুকভাবে তাকাল।

পাটিল সাহেব বলতে লাগলেন, 'ব্লু হেভেন' হোটেলের নাম শুনেছিস?

ওরলির সেই বিরাট হোটেলটা তো?

হ্যাঁ। ওর ম্যানেজার সামতানি সাহেব আমার খুব বন্ধু। তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি; মেরিকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর। হোটেলে তো ক্রুনার মানে গাইয়ে-টাইয়ে দরকার হয়। দ্যাখ যদি একটা গাইয়ের কাজ ওখানে হয়ে যায়। নানা ধরনের লোক হোটেলে আসে, তেমন কারও নজরে পড়ে গেলে বড় চান্স পেয়ে যাবে। তখন তোরা, যা চাস তাই হতে পারে।

পাটিল সাহেবের এই কথাটা মনে ধরল জোহনের। ঝোপড়পট্টিতে পড়ে থাকার চাইতে হোটেলে গাইলেও, অনেক লোক মেরির গান শুনতে পাবে। মেরি যে একজন দারুণ গুণী কলাকার, সে-কথা সবাই একসঙ্গে জানতে না পারলেও কিছু লোক অন্তত জানুক। অত্যন্ত আগ্রহের সুরে সে বলল, নিশ্চয়ই হতে পারে। আপনি মেহেরবানি করে চিঠিটা লিখে দিন।

দিনতিনেক বাদে মেরিকে সঙ্গে করে ওরলির 'হোটেল ব্লু হেভেনে'-র সামনে এসে হাজির হল জোহন। নতুন এই হোটেলটার নামই শুনেছে সে, চোখে এই প্রথম দেখল। আর দেখেই ভিরমি খাবার জোগাড়। কেন না ফাইভ স্টার এই হোটেলটা প্রকাণ্ড এবং ফুললি এয়ার কন্ডিশন্ড। জোহন গুনে-গুনে দেখল। বাড়িটা আঠারো তলা। গোনা শেষ হলো নিজের দিকে তাকাল সে; গায়ে রক্তের ছাকড়া দাগ ধরা ব্যান্ডপার্টির সেই ড্রেসটা রয়েছে। এই পোশাকে ভেতরে যাওয়া যাবে কি না, ভাবতে-ভাবতে গলগল করে ঘামতে লাগল জোহন। আড়চোখে সে লক্ষ করল মেরিও ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে, সেও দারুণ ঘামছিল।

জোহান একবার ভাবল ফিরেই যায়। পরক্ষণে তার মনে হল, এতদূর যখন চলে এসেছে দেখাই যাক কী হয়। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হয়তো বার করে দিতে পারে, কিন্তু মেরে তো আর ফেলবে না। বুক, কপাল আর বাহুসন্ধি দুয়ে গুনে-গুনে বার তিনেক ক্রস এঁকে, ভেতরে-ভেতরে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিল সে। তারপর মেরির একটা হাত ধরে হোটেলের বিশাল ফটকে চলে এল। দারোয়ানরা কিস্তূত পোশাকের জোহনকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না; জোহনও ঢুকবেই। শেষ পর্যন্ত পাটিল সাহেবের চিঠিখানা মুশকিল আসানের কাজ করল। ওটার জোরেই ম্যানেজারের বিশাল কম্পার্টমেন্টে ঢুকতে পারল জোহনরা।

ম্যানেজার সমতানি সাহেবের বিশাল মাংসল শরীর, চৌকো মুখ, গোল চোখ, লালচে পাতলা চুল, ভারী থুতনি, হাত-পায়ের হাড় মোটা-মোটা, গায়ের রং লালচে। দেখেই

বোঝা যায় লোকটার হাই ব্লাড প্রেসার।

জোহন এবং মেরির পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত দ্রুত একবার দেখে নিয়ে সামতানি সাহেব বললেন, তুমি জোহন আর তুমি মেরি?

'জি—' মেরি ও জোহন মাথা নাড়ল।

পাটিল সাহেব কাল আমাকে তোমাদের সম্বন্ধে ফোন করেছিলেন। আজই এবং এখনই মেরির দু-একটা গান শুনতে চাই; মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গাইতে হবে। জানোই তো, হোটেলের ক্রুনারদের কাস্টমারদের সামনে মাইকে দাঁড়িয়ে গাইতে হয়। যাক, যদি গান ভালো লাগে, আজই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবে। ভালো না লাগলে কিন্তু আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না।

চিঠি লেখার পরও পাটিল সাহেব সামতানি সাহেবকে ফোন করেছিলেন। এর জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করল জোহন। কিন্তু সেই সঙ্গে বুকের ভেতর ঢিবঢিবানিটা হঠাৎ বেড়ে গেল। মেরির গান যদি সমতানি সাহেবের ভালো না লাগে? ঘাড় ফিরিয়ে জোহন দেখল, মেরির কপালে ঘাড়ে গলায় এই এয়ার-কন্ডিশন্ড ঘরে বসেও দানা-দানা ঘাম জমে উঠেছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলছে সে; পরক্ষণেই আবার ঘামের দানা জমে উঠছে। মেয়েটা খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে। তাকে সাহস দেবার জন্য তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জোহন বলল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আরে আমি তো সঙ্গে আছি।' বলতে-বলতে নিজেরই গলাটা শুকিয়ে কেমন যেন বেখাপ্পা শোনাতে লাগল।

ওদিকে সামতানি সাহেব টেলিফোনের ইন্টারন্যাল কানেকশনে কাকে যেন কী নির্দেশ দিলেন। তারপর দু-মিনিট যেতে-না-যেতেই যোহনের দিকে ফিরে বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

সামতানি সাহেবের গায়ের সঙ্গে ছায়া হয়ে একটা লিফটে কিছুক্ষণের মধ্যে জোহনরা যেখানে এসে ঢুকল, সেটা ছ'ইঞ্চি পুরু কর্পেটে মোড়া একটা ব্যাঙ্কুয়েট হল। আপাতত সেখানে একজন তবলচি, একজন হরমোনিয়ামওয়ালা এবং একটা মাইক রয়েছে। ডাইনে-বাঁয়ে এবং সামনের দেওয়াল ঘেঁষে সারি-সারি ফোমের চেয়ার।

মাইকের উলটোদিকের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন সামতানি। মেরিকে বললেন, 'মাইকে গিয়ে গাও—'

অর্থাৎ এখন তিনি মেরির ভয়েস টেস্ট করে নিতে চান। জোহান একাধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। মেরি এক পলক তার দিকে তাকাল। নিজের অবস্থাই তার শোচনীয়, তবু তারই মধ্যে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে জোহন সাহস দেবার ভঙ্গিতে বলল, ঠিক আছে, গাও।

বলেই নিজেই অজান্তে কপাল বুক ছুঁয়ে ক্রস আঁকল।

মেরি মাইকের পেছনে গিয়ে খানিকক্ষণ দম বন্ধ করে রইল; তারপর চোখ বুজে জোহনের সেই প্রিয় গানটা 'ও পুরবৈঁয়া মাত্ যা, মাত্ যা' দিয়ে শুরু করল। প্রথম দিকে দু-এক সেকেন্ডের জন্য তার স্বরটা কেঁপে উঠেছিল; তারপরেই তার গলায় কে এক জাদুকরী ভর করে ম্যাজিক দেখিয়ে যেতে লাগল।

মেরির দিক থেকে চোখে সরিয়ে রুদ্ধশ্বাস সামতানি সাহেবের দিকে তাকাল জোহন। তাঁর ওপর মেরির গানের প্রতিক্রিয়াটা কী হচ্ছে সেটাই জানার ইচ্ছ আর কি। দেখা গেল চোখ বুজে সামতানি সাহেব গানের সঙ্গে তাল দিয়ে পা দোলাচ্ছেন। অর্থাৎ লোকটা ইঁদুরকলে পড়ে গেছে; সেখান থেকে আর বেরুবার উপায় নেই।

গান থামলে সামতানি সাহেব চোখ বুজেই বললেন, আরেকটা হোক—

আরেকটাই শুধু নয়, পরপর আরও সাতটা গান গাইতে হল মেরিকে। তারপর সমতানি সাহেবের সঙ্গে আবার তারা নীচে তার কম্পার্টমেন্টে এল। সামতানির মনোভাবটা কী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বলেই জোহনের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে পারছে না। এই শহরে আরব সাগরের এত অফুরন্ত বাতাস, তবু জোহনের মনে হচ্ছে বুক ভরে শ্বাস টানার পক্ষে

তা যথেষ্ট নয়।

নিজের কম্পার্টমেন্টে এসে প্রথমেই জোহনরা কোথায় থাকে, তাদের ঠিকানা কী, মেরির পুরো নাম ইত্যাদি জেনে নিয়ে ইন্টারন্যাল কানেকশনে কাকে যেন কী নির্দেশ দিলেন সামতানি। তারপর জোহানদের দিকে ফিরে বললেন, কী খাবে বলো? সফট ড্রিংক আনতে বলি?

লক্ষণগুলো ভালোই মনে হচ্ছে। বুক ভরে শ্বাস টেনে জোহন বিগলিত হাসল, স্যার, আপনি যা খাওয়াবেন, তাই খাব।

সামতানি সাহেব বোতাম টিপে একটা বয়কে ডেকে সফট ড্রিংক দিয়ে যেতে বললেন। তার একটু বাদেই একটা মধ্যবয়সি লোক টাইপ-করা একটা কাগজ নিয়ে এল। ম্যানেজার তাতে সই করে মেরিকে দিতে-দিতে বললেন, 'এটা তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। তিন মাস তোমার ট্রেনিং পিরিয়ড, এখন চারশো টাকা করে পাবে। তারপর দু-মাস প্রবেশনার হয়ে থাকবে। সেটা কাটাবার পর তোমাকে পার্মানেন্ট করে নেওয়া হবে। প্রবেশনার হিসেবে তোমার মাইনে হবে ছশো, পার্মানেন্ট হলে আটশো। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

খুশিতে উত্তেজনায় মেরি এবং জোহান একইসঙ্গে বলে উঠল, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ্।

সামতানি সাহেব খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখালেন না। সহজভাবে বললেন, ডিউটি আওয়ার্সটা মনে রাখবে; বিকেল পাঁচটা থেকে রাত এগোরোটা।

মেরি জোহন সমস্বরে এবারও বলল, ও-কে স্যার।

এবার সোজা জোহনের দিকে তাকালেন সমতানি সাহেব, অ্যান্ড ইউ—তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। আমার এই হোটেলটা ফাইভ-স্টার। তোমার এই ইউনিফর্ম পরে এখানে আসা চলবে না কিন্তু।

জোহন তৎক্ষণাৎ বলল, আমার ভেতরে ঢোকার কী দরকার। আমি স্যার, উলটোদিকের ফুটপাথে এসে বসে থাকব। মেরির ডিউটি শেষ হলে ও আমার কাছে চলে আসবে।

ও-কে।

কিছুক্ষণ পর বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে-যেতে মেরি বলল, এ সবই তোমার জন্যে। শরবি-ফারেবি-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। নরক থেকে তুমি আমাকে কোথায় তুলে এনেছ!

জোহন জোরে-জোরে হাত এবং মাথা নেড়ে বলল, ছাড়ো ওসব কথা। আজ আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে! ইচ্ছা করছে তোমাকে কাঁধে তুলে নাচতে-নাচতে ঝোপড়পট্টিতে ফিরে যাই।

নকল ভয়ে মেরি বলল, আরে বাপরে, অমন ইচ্ছায় দরকার নেই।

বাস স্ট্যান্ডে এসে লম্বা কিউর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল জোহনরা। মেরি গলা নীচু করে বলল, সেই কথাটা মনে আছে তো?

কোনটা?

তোমরা ইচ্ছা তো পূর্ণ হয়েছে; আমার গান এবার লোকে শুনতে পাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন অফিসে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে কিন্তু।

সবে তো তোমার চাকরি হল। রেকর্ড হোক, রেডিওতে গাও, সিনেমায় প্লে-ব্যাক করো। তারপর তো আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

মেরি রেগে গেল, আমি তোমার কোনও কথা শুনব না। এক মাসের মধ্যে বিয়েটা যদি না হয়, আমি ঠিক চলে যাব।

মেয়েটা যেমন জেদী আর একরোখা, তেমনি অদ্ভুত এক ছেলেমানুষিও আছে তার। জোহনের বেশ ভালোই লাগল। এই মেয়েটা তাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এই ভেবে

কিছুটা মজাও অনুভব করল সে। কিছু না বলে জোহন হেসে ফেলল।

মেরি ঝাঁঝিয়ে উঠল, হাসলে চলবে না। যা বললাম মনে রেখো।

জোহন তখনও হাসতেই লাগল।

চাকরি হবার পর রোজ বিকেলে মেরি হোটেলে চলে আসে। যেদিন ব্যান্ডপার্টির কোনও বায়না থাকে না, সেদিন মেরির সঙ্গেই ঝোপড়াপট্টি থেকে বেরিয়ে পড়ে জোহন। তারপর এদিকসেদিক ঘুরে রাত এগোরোটা নাগাদ উলটোদিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়ায়। আর যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে, সেদিন বাজিয়েটাজিয়ে কথামতো ঠিক এগোরোটাতেই চলে আসে।

চাকরি পাবার পর রাতের খাবারটা হোটেল থেকেই দেবার কথা। হোটেলে বসে খায় না মেরি। প্যাকেটে করে নিয়ে আসে। তারপর জোহনের সঙ্গে ঝোপড়পট্টিতে ফিরে গিয়ে দুজনে ভাগাভাগি করে খায়। হোটেল থেকে যে খাবারটা দেওয়া হয় একজনের পক্ষে তা যথেষ্টই। ওই খাবারে মোটামুটি দুজনের কুলিয়ে যায়।

দিন দশেক কাটবার পর হোটেল ম্যানেজার মেরিকে একটা রেকর্ড প্লেয়ার আর কিছু ওয়েস্টার্ন মিউজিকের রেকর্ড দিয়ে বলেছিল, 'মেরি যে ধরনের গান গায় সেগুলো খুবই ভালো, তবে হোটেল কাস্টমারদের ঝোঁক উগ্র ওয়েস্টার্ন সং এবং মিউজিকের দিকে। ওই রেকর্ডগুলো থেকে সুরটুর চুরি করে মেরি যদি তার গানে ওয়েস্টার্ন টাচ্ দিতে পারে, তা হলে মাত করে দিতে পারবে।

রেকর্ড পাবার পর মেরি আর জোহন যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ রেকর্ডপ্লেয়ার বাজিয়ে যায়। জোহন তার দলের সেই লোকটিকে দিয়ে, যার নাম শৈলেন্দ্র, অনেক গান লিখিয়ে এনেছে। তারপর সেই গানগুলোতে ওয়েস্টার্ন ঢঙে মিউজিক বসাচ্ছে। দিনকতক পর সেই সব গান হোটেলে গেয়ে দারুণ নাম করে ফেলল মেরি।

এ-সবের ফাঁকে-ফাঁকে মেরি কিন্তু সেই কথাটা ভোলেনি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে বিয়ের নোটিশ দেবার জন্য রোজ জেদ ধরছে।

শেষ পর্যন্ত মেরির ইচ্ছাই জয়ী হল। সান্তাক্রুজে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে বিয়ের নোটিশ দিয়ে এল জোহন। আর দিয়েই প্রথমে খবর দিতে গেল ইফতিকার সাহেবকে। ইফতিকার সাহেব সব শুনে প্রথমে একচেট হেসে নিল। তারপর বলল, বহুত খুশিকা বাত। লেকিন গাধধে কা পাঠ্ঠে একটা ছোকরিকে হাতের মুঠোয় পেয়েও নোটিশ দিতে চার মাহিনা কাটিয়ে দিলি!'

জোহন ঘাড় চুলকোতে লাগল। ইফতিকার সাহেব আবার বলল, 'শাদি করছিস, ঠিক আছে। লেকিন এইটা তো দরকার।' আঙুল দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করল সে।

জোহন হাসল, 'হাঁ চাচা, ওটা ছাড়া কিছু হয় নাকি?

কোই বাত নেই, হাজার রুপেয়া অ্যাডভান্স পাবি। আর শাদির পরে পাঁচ রুপেয়া করে মজুরি বাড়িয়ে দেব।

কৃতজ্ঞতায় গলা বুঁজে গেল জোহনের। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সে, পারল না। ইফতিকার সাহেবের পেটে কোনও কথা থাকে না। মুহূর্তে তার মারফত এই খবরটা গোটা 'আনারকলি ব্যান্ডপাটি'-তে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য বাজিয়েরা তাকে ছেঁকে ধরল এবং নাচানাচি আর হুলুস্থূল জুড়ে দিল। সবাই দারুণ খুশি।

সমস্বরে তারা চেঁচাতে লাগল, শাদি মুবারক হো, লেকিন ভোজটা না খাওয়ালে ছাড়াচি না চাচা—

জোহনকে দলের অন্য বাজনাদাররা চাচা বলেই ডাকে।

হেসে-হেসে জোহন বলল, ঠিক আছে, ভোজ দেব।

এরপর ঝোপড়াপট্টিতে ফিরে সে সোমবারিকে খবরটা দিতে গেল। সব শুনে গালে একটা হাত রেখে চোখ গোল করল সোমবারি, হাঁ!

জোহন হেসে মাথা নাড়ল, হাঁ।

উত্তর প্রদেশের একটা অশ্লীল ছড়া কেটে সোমবারি বলল, তা হলে শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেলে ফুলুটবালা! আমি কিন্তু পয়লা দিনই বলেছিলাম, মনে আছে?

আছে।

সোমবারির পর গিল্ডারকে খবরটা দিয়ে নিজের ঝোপড়িতে ফিরল জোহন। ফিরেই মেরিকে বলল, একটা কাগজ কলম নাও।

মেরি অবাক। বলল, কেন?

বিয়ের নোটিশের খবরটা দিয়ে জোহন বলল, কাকে-কাকে ইনভাইট করবে, কী-কী খরচ হবে, তার লিস্ট করতে হবে না?

দুজনে মিলে অনেক খেটে-খুটে একটা তালিকা করে ফেলল। তারপর মেরি বলল, আমি একটা কথা ভেবে রেখেছি।

কী?

বিয়েটা হয়ে গেলে তোমাকে আমি ব্যান্ডপার্টি থেকে ছাড়িয়ে আনব। আর ওই ব্যান্ডপার্টির ড্রেসটা পরে ঘুরে বেড়াতে দেব না।

ও ক্রাইস্ট, ব্যান্ডপার্টি ছাড়লে খাব কী!

আমাদের হোটেলের ম্যানেজারকে বলে মিউজিক হ্যান্ডের একটা চাকরি জোগাড় করে দেব।

'মরে যাব।' জোহন বলতে থাকলে,‘‘বিলকুল ডেথ হয়ে যাবে আমার। ব্যান্ডপার্টি ছাড়া লাইফে আর কিছু জানি না। এখন যদি অত বড় হোটেলে বাজাবার চাকরি নিই, স্রেফদিম আটকে যাবে।'

সে দেখা যাবে।

বিয়ের আর দিন পনেরো বাকি।

এর মধ্যে ঠিক হয়েছে, বিয়ের তারিখে ঘুম থেকে উঠে। ওরা সোজা সান্তাক্রুজের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে চলে যাবে। এ-বিয়ের তিনজন সাক্ষী থাকবে-ডাক্তার গিল্ডার, আজবলাল আর ইফতিকার সাহেব। তারা অবশ্য যে-যার সুবিধামতো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে চলে যাবে। সেখানে সই সাবুদ চুকিয়ে সবাই যাবে মাহিম চার্চে। চার্চে ব্যান্ডপার্টির লোকেরা এবং অন্যান্য গেস্টরা এসে অপেক্ষা করবে, শুভেচ্ছা জানাবার জন্য। সেখান থেকে সবাই যাবে মাঝারি গোছের একটা হোটেলে। ভোজ-টোজের ব্যবস্থা সেখানেই।

দিনগুলো যেন নেশার ঘোরে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু বিয়ের ঠিক পনেরো দিন আগে হঠাৎ তাল কেটে গেল।

সেদিন রাত এগারোটায় 'ব্লু হেভেন হোটেল'-এর উলটোদিকে যথারীতি দাঁড়িয়ে ছিল জোহন। মেরি তার ডিউটি শেষ করে বেরিয়ে এল। রাস্তা পেরিয়ে এধারে আসার আগেই জোহন দেখতে পেল, খুশি আর উত্তেজনায় মেরির চোখ চকচক করছে। ইদানীং সর্বক্ষণই দারুণ এক আনন্দের জোয়ারে ভাসছে মেরি। কিন্তু তার এই উত্তেজনাটা অন্যরকম। স্থির নিস্পলক চোখে তাকিয়ে রইল জোহন।

রাস্তা পেরিয়ে এপারে এল মেরি। জোহন কিছু বলবার আগেই উচ্ছাসের গলায় সে বলে উঠল, জানো ফুলুটবালা, আজ একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে। তোমার আমার দু-জনের লাক এবার খুলে যাবে।

আচানক (হঠাৎ) কী ব্যাপার ঘটে গেল।

জোহন রীতিমতো অবাক।

মেরি বলল, আন্দাজ করো না।

পারছি না।

আজ এক রেকর্ড কোম্পানির ম্যানেজার হোটেলে এসেছিল। আমার গান শুনে সে একেবারে যাকে বলে ম্যাড। তার ইচ্ছে আমাকে দিয়ে রেকর্ড করাবে।

জোহনের ইচ্ছা হল, সে এখুনি এই রাস্তায় হাত-পা ছেড়ে বন-বন করে কয়েক পাক নেচে নেয়। দারুণ খুশিতে তার হৃৎপিণ্ড যেন লাফাতে লাগল। সে বলল, সচ্!

'সচ্।' মেরি ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'সেবাস্টিয়ান সাহেব আমাদের ঠিকানা নিয়েছে। দু-চার দিনের মধ্যে কনট্রাক্ট করতে আসবে।'

জোহন বলল, মেরি, তোমাকে কাঁধে তুলে নেচে নেব?

এই না-না, খবরদার না।

দু-চারদিন পর নয়, ঠিক তার পরের দিনই একটা দামি বিদেশি গাড়িতে করে সেবাস্টিয়ান সাহেব সকালের দিকে জোহানদের ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়াপট্টিতে এসে হাজির। গাড়িটা অবশ্য ঝোপড়াপট্টির ভেতর পর্যন্ত আসতে পারেনি। কেন না এখানকার গলি এত সরু যে, অত বড় ইমপোর্টেড কার ঢোকার মতো জায়গা নেই। তা ছাড়া ঝোপড়াপট্টিটা এমনই নোংরা আর আবর্জনায় বোঝাই যে, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে।

আজ জোহন ঝোপড়াপট্টিতেই ছিল। কারণ 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র হাতে আজকের দিনটার কোনও বায়না নেই। থাকলে ঢের আগেই সে বেরিয়ে যেত।

সেবাস্টিয়ান সাহেবের বয়েস তিরিশ-বত্রিশ। গায়ের রং বেশ কালো। লম্বাটে মুখ। প্রায় ছ'ফুটের মতো হাইট। মেরুদণ্ড টান-টান। আজকালকার ছোকরাদের মতো চওড়া জুলপি তাঁর, ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়া বড়-বড় চুল, পরনে দামি বেল-বট্স ও হাওয়াই শার্ট। লোকটা কেরালার ক্রিশচান।

সেবাস্টিয়ান সাহেবকে কোথায় বসাবে, তাকে নিয়ে কী করবে, প্রথমটা ভেবে পেল না জোহন। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। ঘরের একমাত্র হাতল-ভাঙা চেয়ারটাকে ভালো করে মুছেটুছে শেষ পর্যন্ত তাতেই তাকে বসিয়ে দৌড়ে কাছের একটা দোকান থেকে সফট ড্রিংকের বোতল আর স্ট্র নিয়ে এল।

সেবাস্টিয়ান সাহেব কিছুতেই খাবেন না। জোহন বলল, প্রথম দিন এলেন, এটা না খেলে আমরা খুব দুঃখ পাব।

এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 'হোটেল ব্লু হেভেন'-এর মতো একটা ফাইভ-স্টার হোটেলের রূপসি ক্রুনার মেরি যে থাকতে পারে, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সেবাস্টিয়ান সাহেব। যাই হোক, জোহনের বারবার অনুরোধে বিষ গেলার মতো করে সফট ড্রিংকটা গিলতে হল তাকে।

এতক্ষণ জোহন তাকে নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে ছিল যে, সেবাস্টিয়ান সাহেব বিশেষ কোনও কথা বলার সুযোগ পাননি। এবার মেরির দিকে তাকিয়ে জোহন সম্বন্ধে জিগ্যেস করলেন, ইনি কে?

মেরি জোহনের পরিচয় দিয়ে জানাল, সে তার ভাবী স্বামী।

সেবাস্টিয়ান সাহেব অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে জোহনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার মেপে নিল। তারপর বলল, ভাবী স্বামী বলতে-বিয়ে হয়নি?

মেরিই উত্তরটা দিল, না। তবে শিগগিরই হচ্ছে।

জোহন বাজাতে বেরোয়নি, তার পরনে আধময়লা একটা পাজামা আর গেঞ্জি। সেবাস্টিয়ান তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন, বিয়ে হয়নি। অথচ এই দুটি অসমবয়সী নারী-পুরুষ একসঙ্গে ঝোপড়াপট্টির এই ঘরে থাকে কি না। কিন্তু এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা অশোভন। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি কি করেন?

জোহন উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মেরি বলে উঠল, উনি খুব বড় মিউজিসিয়ান, বম্বের সবচেয়ে নাম করা ব্যান্ডপার্টিতে ক্ল্যারিওনেট বাজান।

সেবাস্টিয়ান সাহেবের চোখে তাচ্ছিল্যের মতো কিছু ফুটে উঠল। কিন্তু মুখে তিনি বললেন, আপনার মতো একজন গুণী লোকের সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হল। যাক, এবার কাজের কথাটা সেরে ফেলি।

খুব আগ্রহের গলায় জোহন বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আর কোনওরকম ভণিতা-টণিতা না করে সেবাস্টিয়ান সাহেব যা বললেন, তা মোটামুটি এইরকম। মেরিকে তাঁদের কোম্পানি তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করতে চান। এর জন্যে মাসে তাঁরা দেড় হাজার টাকা করে দেবেন। অবশ্য এই শর্তে রাজি হলে মেরিকে হোটেলের চাকরিটা ছাড়তে হবে।

দেড় হাজার টাকা। বিমূঢ়ের মতো জোহন মেরির দিকে তাকাল। মেরির চোখেও সেই একই বিমূঢ়তা। কথাটা নিজেদের কানে শুনেও তারা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

সেবাস্টিয়ান জিগ্যেস করলেন, কি, রাজি?

জোহান একটা ঘোরের মধ্যে থেকে যেন লাফিয়ে উঠল, নিশ্চয়ই রাজি। হাজার বার রাজি।

আরেকটা কথা—

বলুন—

মেরিজির নামটা ভারী সিম্পল, তেমন ড্র নেই। রেকর্ড বাজারে বেরুবার আগে নামটা বদলে দিতে হবে।

সেবাস্টিয়ান সাহেবের সব কথা বুঝতে পারল না জোহন। তবে এটুকু আন্দাজ করল, নাম করার খাতিরে মেরির নতুন নামকরণ দরকার।

সেবাস্টিয়ান সাহেব আবার বললেন, ভাবছি মেরিজির নাম বদলে সুজাতা রাখব। আপনি কি বলেন জোহন সাহেব?

মেরির ভালো হলে সব কিছুতেই রাজি জোহন। সে প্রায় লাফিয়ে উঠল, দারুণ খুব সুরত নাম। আপনি ওই নাম দিয়ে দিন।

'ভেরি গুড—' সেবাস্টিয়ান সাহেব খুশি হয়ে পকেট থেকে ছাপানো কনট্রাক্ট ফর্ম বার করে মেরিকে বলল, এটা পড়ে নীচে একটা সই করে দিন।

জেহন ব্যস্তভাবে বলল, পড়বার দরকার নেই। মেরি, সই লাগাও।

মেরি সই করে দিলে ফর্মটা ভাঁজ করে পকেটে পুরতে পুরতে সেবাস্টিয়ান সাহেব পড়লেন। মেরির হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশনস! আমার বিশ্বাস এক বছরের মধ্যে হোল ইন্ডিয়া আপনার নাম জেনে ফেলবে। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।' জোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা চলি ! আবার দেখা হবে।'

সেবাস্টিয়ান সাহেব চলে গেলে মেরি আর জোহান একটা অলৌকিক স্বপ্নের মধ্যে যেন দাঁড়িয়ে রইল।

রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী হোটেলের চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে মেরিকে। এ মাস ফুরোতে সামান্য ক'টা দিন বাকি। মেরি সেবাস্টিয়ান সাহেবকে বলে দিয়েছে, মাসের এ ক'টা দিন কাজ করেই হোটেলের চাকরিটা ছেড়ে দেবে।

যাই হোক, চুক্তিতে সই করার পর তিনটে দিন কেটে গেছে। আজও ঘড়ির কাঁটার মতো ঠিক রাত এগোরোটায় জোহন 'হোটেল ব্লু হেভেন'-এর উলটোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে দেখল, সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে মেরি বেরিয়ে আসছে। মেরি জেব্রা লাইন দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এপারে চলে এল। সেবাস্টিয়ান সাহেব কিন্তু এলেন না। তার গাড়ি রাস্তার গা ঘেঁষে পার্ক করা ছিল; উঠে কাম্বালা হিলের দিকে চলে গেলেন।

জোহন জিগ্যেস করল, সেবাস্টিয়ান সাহেবকে তোমার সঙ্গে দেখলাম না?

মেরি আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ—' বলেই জোহনের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখ নামাল। অন্যদিনের মতো তাকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে না। কেমন যেন একটু চিন্তিত আর বিষন্ন মেরি।

জোহন তাকে লক্ষ করতে-করতে বলল, কী ব্যাপার, তোমাকে কীরকম দেখাচ্ছে। শরীর খারাপ নাকি?

না।

তবে?

চলো, বাড়ি ফিরে বলব।

বাসে উঠে চুপচাপ পাশাপাশি বসে ওরা ঝোপড়পট্টিতে ফিরে এল। সারাটা রাস্তা দারুণ এক উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে জোহনের। তার ভয়, রেকর্ড কোম্পানি এর মধ্যে মেরি সম্বন্ধে মত বদলে ফেলেছে কি না। তা হলে যে সুযোগটা এসেছিল, সেটা কি হাতছাড়া হয়ে যাবে? ঘরে ঢুকেই জেহন বলল, কী হয়েছে এবার বলো।

তক্ষুনি কিছু বলল না মেরি। জোহনের উদ্বেগ দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, সেবাস্টিয়ান সাহেব একটা কথা বলছিল—

কী?

শুনলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে। আমি কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না। কথাটা তোমাকে বলতে সাহস হচ্ছে না, আবার না বললেও নয়।

জোহান শ্বাসরুদ্ধের মতো বলল, ওরা তোমাকে দিয়ে গান গাওয়াবে না?

মেরি বলল, না-না, সেসব কিছু নয়।

তা হলে?

সেবাস্টিয়ান সাহেব এখন আমাদের বিয়েটা বন্ধ রাখতে বলছেন।

কেন?

মেরি এবার যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। সেবাস্টিয়ান সাহেব বলেছেন, মেরি বিয়ে না করলে রেকর্ড কোম্পানির পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। কেন না গায়িকা যদি রূপসি এবং তরুণী হয়, তাতেই লোককে আকর্ষণ করা যায়। তার ওপর অবিবাহিত হলে তো কথাই নেই। মেরি এমনিতেই সুন্দরী, যুবতী এবং ভালো তো গায়ই। এখন সেবাস্টিয়ান সাহেবের অনুরোধ রেখে, সে যদি বিয়েটা অন্তত বছর দুয়েকের জন্য স্থগিত রাখে, রেকর্ড কোম্পানি তা হলে কুমারী মেরির রূপ-যৌবন ইত্যাদিকে গ্ল্যামার হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। এমন স্টান্ট তারা দেবে, যাতে হু-হু করে মেরির রেকর্ড বাজারে পড়তে-না-পড়তেই বিক্রি হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে দেশ জুড়ে রাতারাতি তার নামও হবে।

হৃৎপিণ্ডের তলায় কোথায় যেন তীক্ষ্ণ ব্যথার মতো অনুভব করল জোহন। কিন্তু মেরির যাতে ভালো হয়, তার জন্য সব কিছুতেই সে রাজি। হেসে-হেসে দারুণ উৎসাহের গলায় বলল, এই ব্যাপার? আমি ভেবেছিলাম না জানি কি। সেবাস্টিয়ান সাহেব যা বলেছে, তাই হবে। এতে যখন তোমার ভালো হচ্ছে, ওদেরও সুবিধে হচ্ছে, বিয়েটা দু-বছর পিছিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই।

'কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে। তা ছাড়া—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল মেরি।

জোহন জিগ্যেস করল, তা ছাড়া কী?

আমাদের বিয়ের কথা সবাই জেনে গেছে। অনেককে নেমন্তন্নও করা হয়েছে। এখন বিয়েটা না হলে লোকে কী বলবে।

এর জন্যে ভেবো না। সবাইকে বুঝিয়ে আমি ম্যানেজ করে নেব।

এ-ব্যবস্থায় সায় দিতে পারছিল না মেরি। সে বলল, 'তার চাইতে হোটেলের চাকরিটাই আমার থাক। সেবাস্টিয়ান সাহেবকে বলে দেব রেকর্ড করে আমার দরকার নেই।'

জোহন প্রায় আঁতকে উঠল, ও কাজও কোরো না—ফর গডস সেক। সুযোগ বারবার আসে না মেরি।

মেরি কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে কিছুই বলতে দিল না জোহন। পরের দিন ব্যান্ডপার্টির হাতে বায়না-টায়না ছিল না। তবু জোহন ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়ল। বিয়েতে যাদের-যাদের নেমন্তন্ন করে এসেছিল, তাদের সবার কাছে গিয়ে জানিয়ে এল,

আপাতত এ-বিয়ে হচ্ছে না। তাই নেমন্তন্নটা নাকচ করতে হচ্ছে। মেহেরবানি করে তারা যেন ক্ষমা করে দেয়।

সবাই বিয়ে পেছোবার কারণ জিগ্যেস করল। স্পষ্ট করে কোনও উত্তর দিল না জোহন। তবে সোমবারি আর ইফতিকার সাহেবকে কারণটা খুলে বলল। সব শুনে ইফতিকার সাহেব একদমে মিনিট পাঁচেক খিস্তি করে বলল, 'শালা গাধধে কি পাঠঠে। ভয়েস গাড়িকা ভয়েস। ঘাড়ে করে তোর শক্কর (চিনি) টেনে বেড়ানোই সার। সেই শককর খাবে আরেকজন।'

সোমবারিও দাঁতের ফাঁক দিয়ে পানের পিচু কেটে চোখ, কোঁচকাল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি একটা পুরুষ মানুষ কি না। হিজড়ে-টিজড়ে নাও তো? নইলে হাতের খাবার নিজের মুখে না পুরে কেউ অন্যের মুখে ঢোকায়! শালে ক্যা মুরদ রে—'

বলেই ভারী কোমরে অশ্লীল লছক তুলল। জোহন হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, 'কী যা-তা বলছি ভাবী। কারও খাবারে কেউ দাঁত বসাতে পারবে না। মেরি যেমন আছে, তেমনই থাকবে। তবে বিয়েটা এখন না হলে ওর পক্ষে ভালো হবে কিনা, তাই।'

'ভালো হলেই ভালো।' সোমবারি দুটো হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দ্যাখো শেষ পর্যন্ত এ-দুটো যেন চুষতে না হয়।'

দেখতে-দেখতে মাসটা কাবার হয়ে গেল। আর নতুন মাসের পয়লা তারিখেই হোটেলের চাকরিটা ছেড়ে দিল মেরি। চাকরি ছাড়ার পরদিন থেকেই রেকর্ড কোম্পানির রিহার্সাল শুরু হল। কোলাবার কাছে কোম্পানির একটা রিহার্সাল রুম আছে। রোজ সকালে সেবাস্টিয়ান সাহেব নিজে এসে ঝোপড়াপট্টি থেকে মেরিকে সেখানে নিয়ে যান; আবার রাত্রে নিজে ফেরত দিয়ে যান। এই নিয়ে আসা এবং পৌঁছে দেবার কাজটা কোম্পানির যে-কোনও ড্রাইভার বা একজন সাধারণ কর্মচারীর ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়। তার মতো একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে এ-কাজ খুবই দৃষ্টিকটু। কিন্তু সেবাস্টিয়ান সাহেবের মতে মেরি একজন নতুন শিল্পী; তাঁকে সর্বক্ষণ সঙ্গ এবং উৎসাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি নিজেই ছুটে-ছুটে আসেন।

যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে, সেদিন ভোরেই বেরিয়ে যেতে হয় জোহনকে। সেদিন আর সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না। কেন না সে বেরুবার পর সেবাস্টিয়ান সাহেব আসেন। রাতে ফিরে অবশ্য মেরিকে ঝোপড়পট্টিতে দেখতে পায়। দু-একটা কথাও হয় তার সঙ্গে। উদ্দীপনা ভরা গলায় জোহন জিগ্যেস করে, আজ কীরকম রিহার্সাল হল, সেবাস্টিয়ান সাহেব কী বললেন, কার-কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ইত্যাদি।

তবে যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে না, সেদিন সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। মেরি যখন তার সঙ্গে ঝোপড়াপট্টির বাইরে গিয়ে গাড়িতে ওঠে, সেও সঙ্গে-সঙ্গেই যায়। তারপর ওরা চলে গেলে হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে কেমন এক শূন্যতা অনুভব করে জোহন।

পুরো দেড় মাস রিহার্সালের পর মেরি-নো-না মেরি নয়, সুজাতার রেকর্ড বেরুল। আর তার আগে খবরের কাগজে তার ছবি দিয়ে, রেডিওতে পাবলিসিটি করে বাজার গরম করে রেখেছিলেন সেবাস্টিয়ান। সত্যি-সত্যিই রেকর্ডটা বেরুতে না বেরুতেই হু-হু করে বিক্রি হয়ে গেল। চাহিদা মেটাবার জন্য নতুন করে আবার রেকর্ডটার প্রিন্ট করতে হলো। দু-পিঠে দু-খানা গান দিয়ে রেকর্ড করেছিল মেরি। প্রথম গানটা হল—'ও পুরবৈঁয়া মাত্ যা, মাত্ যা —'। দ্বিতীয় গানটা হল—'আচানক এক মুসাফির আয়া থা, ও চলে গয়ে—'। দুটো গানই তাকে শিখিয়েছিল জোহন।

রেকর্ডটা যাতে বাজারে চলে, যাতে মেরির খুব নাম হয়, সেইজন্য মাহিম চার্চে পর-পর চার বুধবার জোহন মোমবাতি জ্বলিয়ে দিয়ে এসেছে, আর ঈশ্বরের কাছে বার-বার প্রার্থনা করেছে। যাই হোক, রেকর্ড বেরুবার পর সত্যি-সত্যি দারুণ নাম হয়ে গেল মেরির। কাগজগুলো লিখল, এমন 'গোল্ডেন ভয়েস' গত পাঁচশ বছরে শোনা যায়নি।

মেরি খুবই অভিভূত। সে জোহনকে বলে, ‘আমার এই নাম, এই খাতির-সব, সব তোমার জন্যে।’

জোহন যেমন খুশি তেমনই উত্তেজিত। মেরিকে কাঁধে তুলে নাগরদোলার মতো সে বনবন পাক খেতে থাকে। এদিকে সেবাস্টিয়ান সাহেবও দারুণ উত্তেজিত। রেকর্ড বেরুবার তিন দিন বাদে ঝোপড়পট্টিতে এসে তিনি বললেন, ‘পুরোনো কনট্রাক্টটা বাতিল করতে হবে।’

মেরি আর জোহন চমকে উঠল, কেন?

প্রথম রেকর্ড বেচে কোম্পানি কম করে এক লাখ টাকা প্রফিট করবে। আপনাকে মাসে দেড় হাজার টাকা দিয়ে কোম্পানি ডিপ্রাইভ করতে চাইছে না। ভাবছি, এখন থেকে মাসে চার হাজার টাকা পাবেন আর লাভের ওপর ফাইভ পারসেন্ট।

জোহন ও মেরি বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল। সেবাস্টিয়ান সাহেব পুরোনো চুক্তিপত্র ছিড়ে ফেলে নতুন কনট্রাক্টে সাইটই করিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, ‘এক রেকর্ডেই আপনার নাম হয়ে গেছে; পিপল এখন আপনাকে চায়। এই সুযোগ ছাড়া হবে না। এখন রেকর্ডের পর রেকর্ড বাজারে ছাড়তে হবে।’

জোহন প্রতিটি অক্ষরে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করল, নিশ্চয়ই।

এবার আমার একটা কথা আছে।

কী?

বলতে লজ্জা হচ্ছে জোহন সাহেব। তবে আপনি বুদ্ধিমান লোক, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখবেন।

জোহন বলল, আপনি বলুনই না।

সেবাস্টিয়ান সাহেব বললেন, মেরিজির এখন নাম হয়েছে, আরও হবে। সিনেমার লোক, রেডিওর লোক, টেলিভিশনের লোক ঝাঁক বেঁধে তখন ওর কাছে আসতে থাকবে। এই ঝোপড়াপট্টিতে আমি আসি কারণ, আমি আপনাদের ঘরের লোক হয়ে গেছি। কিন্তু অন্য লোকেরা একদিন এলে, আর দ্বিতীয় দিন আসতে চাইবে না। এতে মেরিজির ক্ষতি হবে। তাই ভাবছিলাম—

কী?

মেরিন ড্রাইভে আমাদের কোম্পানির একটা ফ্ল্যাট আছে। মেরিজি যদি সেখানে থাকেন, সব দিক থেকেই সুবিধে হয়। আপনি কী বলেন?

শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জোহন। তারপর বলল, ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন—

মেরি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ফুলুটবালা সেখানে যাবে তো?

সেবাস্টিয়ান সাহেব থতিয়ে গেলেন। বিব্রতভাবে বললেন, ‘রোজ নিশ্চয়ই ওখানে একবার করে যাবে। তবে ওটা তো কাজের জায়গা। মানে বেশি লোক থাকলে—’ বলতে-বলতে থেমে গেলেন।

মেরি বলল, তাহলে আমি ওখানে কী করে থাকব? ফুলুটবালা এখানে থাকবে, আমি অত দূরে—

জোহান শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। মেরির জীবনে যে সুযোগ এসেছে, তার জন্যে সেটা নষ্ট হয়ে যাক, সে তা চায় না। দ্রুত বলে উঠল, ‘সেবাস্টিয়ান সাহেব, —মেরির কথা। আপনি শুনবেন না। এটা যখন বিজনেসের ব্যাপার, ও মেরিন ড্রাইভে গিয়ে থাকবে। আগে কাজ, তারপর অন্য কথা।’

সেবাস্টিয়ান সাহেব বললেন, ‘থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই তো বুদ্ধিমান লোকের মতো কথা।’

জোহন এবার বলল, আমি কিন্তু রোজই একবার করে যাব।

সে তো আমি আগেই বলেছি। আপনি যাবেন, মেরিজিও রোজ একবার করে এখানে আসবেন। আচ্ছা, আজ চলি।

এর দিন তিনেকের মধ্যে মেরিন ড্রাইভের ফ্ল্যাটে চলে গেল মেরি। ওখানে যাবার পর সমস্ত জীবনটাই যেন শূন্য মনে হতে থাকে জোহনের। এতদিন সে ছিল ভবঘুরে, চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে। তার দিনগুলো ছিল নারীসঙ্গহীন, নিরুৎসাহী। দুম করে এই মেয়েটা ক'দিনের জন্য এসে সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে। ঝোপড়াপট্টিতে এই নোংরা ঘরটা জুড়ে যেন ছড়িয়ে ছিল মেরি। সে চলে যাবার পর অনুভব করা যাচ্ছে, কতটা জায়গা সে ফাকা করে দিয়ে গেছে।

যাই হোক, প্রথম দিকে রোজই একবার করে মেরিন ড্রাইভের ঝকঝকে দামি ফ্ল্যাটে গেছে জোহন। যখনই গেছে চোখে পড়েছে, সেবাস্টিয়ান সাহেব ওখানেই আছেন। আর দেখা গেছে গানটানের ব্যাপারে মেরি খুবই ব্যস্ত। এখন রিহার্সাল-টিহার্সাল ওখানেই হচ্ছে। তার নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। তবু তার মধ্যে কাছে ছুটে এসেছে মেরি। সামনে বসিয়ে গল্প করেছে, দামি-দামি খাবার খাইয়েছে। জানিয়েছে, এভাবে তার ভালো লাগছে না। জোহন তাকে বুঝিয়েছে, এখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। তাতে সেবাস্টিয়ান সাহেব চটে যাবেন, সুযোগটা হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবে। চারদিকে নাম আরও ছড়িয়ে যাক, পয়সা-টয়সা হোক, তখন দু-জনে একসঙ্গে থাকার অসুবিধে হবে না।

কিন্তু কিছুদিন পর মেরির কাজকর্মের চাপ এত বেড়ে গেল যে, তাকে ধরাই মুশকিল। দশ দিন এলে একদিন হয়তো দেখা হয়। বাকি দিনগুলো এসে জোহন শোনে, সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে মেরি। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে থেকেও তাকে ধরা যায় না।

এর মধ্যে মেরির আরও রেকর্ড বেরিয়েছে; রেডিওতে তার গান শোনা যাচ্ছে। টি-ভি প্রোগ্রামেও তার ডাক পড়ছে। টেলিভিশনে তার চেহারা এখন দেখা যায়। তা ছাড়া প্লে-ব্যাকের জন্য সিনেমার লোকেরা হানা দিচ্ছে। সিনেমার পত্রিকাগুলোতে, ফ্যাশন বা ইভ ম্যাগাজিনে আর দৈনিক পত্র-পত্রিকার ফিল্ম বা গান-বাজনার জন্য নির্দিষ্ট কলামে তার ইন্টারভিউ ও ছবি বেরুচ্ছে। জোহন জানে চারদিকে মেরির এত নামের মূলে রয়েছে একটি মাত্র লোক-তিনি সেবাস্টিয়ান সাহেব। সে খবর পেয়েছে। সেবাস্টিয়ান সাহেব নাকি এখন মেরির বিজনেস ম্যানেজার। রেডিওটিভি-ফিল্ম-যেখান থেকেই লোকজন আসুক না, সেবাস্টিয়ান সাহেবই তাদের সঙ্গে ব্যাবসা-সংক্রান্ত কথা বলে থাকেন।

জোহন অনুভব করতে থাকে, মেরির যতই নাম হচ্ছে, ততই সে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। যে মেরিকে জোহান একদিন রাস্তা থেকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তুলে এনেছিল, যে মেরি ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়াপট্টিতে একদিন তাকে ঘিরে ছোট্ট একটা সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেছিল, সে যেন অন্য কেউ। একেক দিন ঝোপড়পট্টিতে সোমবারির সঙ্গে আচমকা দেখা হলে সে বিদ্রুপের সুরে বলে, 'শাদিটা কবে হচ্ছে?'

জোহন বিব্রত হয়, উশখুশ করতে থাকে। কোনও উত্তর দেয় না।

অশ্লীল ছড়া কেটে আঙুলের ডগা দিয়ে জোহনের খুতনিটা নাড়তে-নাড়তে সোমবারি এবার বলে, 'প্যানটুল-পাজামা ছেড়ে এবার ঘাঘরা আর শাড়ি পরো ফুলুটবালা। শালে ক্যায়সা মরদ তুমি! জওয়ান লড়কিটাতে হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিলে!'

ব্যান্ডপার্টির ইফতিকার সাহেবের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, তখনই এক কথা বলে যায় সে, 'গাধধে কা পাঠ্‌ঠে, ভয়েস গাড়ি-কা-ভয়েস, ঘাড়ে করে গুড়ই বয়ে গেলি! আর সেই গুড় খাচ্ছে এখন অন্য লোকে। তখন বিয়েটা করে ফেললে রাজার হালে থাকতে পারতিস। শালে উলুকা বান্দর।'

জোহন উত্তর দেয় না। সোমবারি বা ইফতিকার সাহেবের মতো করে না বললেও, চেনাশোনা লোকেরা তাকে দেখলেই মুখ টিপে হাসে।

দেখতে-দেখতে একটা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে আরও নাম হয়েছে মেরির। এখন রেডিওর বিবিধ ভারতী খুললেই তার গলা শোনা যায়, টিভি খুললেই তার মুখ, পত্র-পত্রিকায় আর পোস্টারেপোস্টারে তার ছবি, ফিল্মের হিরোইনদের গলায় তার গান। ফিল্মের

গান বাদ দিলে অন্য সব গানই জোহনের শেখানো গান। আশ্চর্য, আজকাল আনারকলি ব্যান্ডপার্টিকে যারা বায়না করতে আসে, তারা সুজাতা অর্থাৎ মেরির গানই বাজাবার কথা বলে। যে হাউইটাকে জোহন আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিল, ক্রমশ সেটা অনেক—অনেক দূরে চলে গেছে। এখন আর তাকে কোনওরকমেই ছোঁয়া যাবে না।

অবশ্য এই এক বছরে বেশ কয়েকবার মেরিন ড্রাইভে এসেছে জোহন। যতবার এসেছে, দেখেছে মেরিদের প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে দামি-দামি ইম্পোর্টেড কার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে এই গাড়িগুলো যাদের, তারা মেরির কাছেই এসেছে। এই সব চোখ-কালসানো গাড়ি দেখবার পর ব্যান্ডপার্টির ড্রেস পরে জোহন ভেতরে যেতে ভরসা পায়নি; বেশির ভাগ দিনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে সে। তারপর বাইরে থেকেই ফিরে গেছে। এক আধাদিন সাহসে ভর করে ভেতরে ঢুকলেও মেরির সঙ্গে কচিৎ কখনও দেখা হয়েছে। যখনই সে সাহস করে ওপরে এসেছে, সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেবাস্টিয়ান সাহেব তাঁকে দেখলে ইদানীং খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। রূঢ়ভাবে বলেছেন, মেরি এখন ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে দেখা হবে না।

জোহন কষ্ট পেয়েছে, তবু এসেছে। মেরির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে সে অবশ্য বিরক্ত হয়নি, রূঢ়তাও প্রকাশ করেনি, তবে বিব্রত মুখে বলেছে, 'আজ বড় ঝামেলায় আমি, তুমি আরেক দিন এসো।'

জোহন টের পাচ্ছিল, প্রচুর টাকা, প্রচুর নাম আর গ্ল্যামার মেরিকে একটু-একটু করে যেন বদলে দিচ্ছে। সে ঠিক করে ফেলেছিল, মেরিন ড্রাইভে আর যাবে না। কী হবে গিয়ে? সত্যি-সত্যিই এক বছর বাদে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছে জোহন।

সেবাস্টিয়ান সাহেব মেরিকে সেই যে ঝোপড়াপট্টি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তারপর দু-বছর কেটে গেছে।

এই দু-বছরে জোহনের চেহারায় হঠাৎ যেন বয়সের ছাপটা বড় বেশি করে পড়ে গেছে। পিঠটা ঈষৎ বেঁকে গেছে, চুলের বেশির ভাগই সাদা, চামড়া কুঁচকে মুখে এখন অসংখ্য রেখা। চোখদুটো ঘোলাটে আর বিষণ্ণ দেখায়।

জীবনটা মেরি আসার আগের সেই পুরনো দিনগুলোর মতোই আজকাল কেটে যাচ্ছে। যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে, সেদিন সকালে উঠেই স্নান-টান করে বেরিয়ে পড়ে জোহন। আগের মতোই দুপুরে ইরানি কি পাঞ্জাবিদের হোটেলে খেয়ে নেয়। তারপর রাত্রেও হোটেলে গিয়ে এক বোতল ঠাররা এবং রুটি মাংস কিংবা ইডলি সম্বর খেয়ে লাস্ট ট্রেনে ঝোপড়াপট্টিতে ফিরে আসে। আর যেদিন বাজাবার ব্যাপার থাকে না, ঝোপড়াপট্টিতেই পড়ে থাকে সে। অবশ্য এই অলস দিনগুলোতে বস্তির বাচ্চাকাচ্চারা তাকে ধরে সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে জোহনকে একটা-না-একটা ফিল্মের গান বাজিয়ে শোনাতে হয়। আর সেই গানগুলোর বেশির ভাগই মেরির গাওয়া। কিন্তু এতে আর কতটা সময় কাটো! কিছুক্ষণ বাদে ঝোপড়াপট্টিতে ফিরে দড়ির খাটিয়ায় চুপচাপ শুয়ে থাকে জোহন। মেরি চলে যাওয়ার পর এই ঝোপড়িতে রান্না-বান্নার পাট চুকে গেছে। যেদিন সে ঘরে থাকে, উদিপিদের সেই হোটেলটা থেকে দু-বেলা খাবার দিয়ে যায়।

মেরি চলে গেছে ঠিকই কিন্তু এখানে তার কিছুদিন কাটিয়ে যাবার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে, অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসন, দু-চারটে শাড়ি-জামা-টামা পড়ে আছে। দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনটা ভারী হয়ে যায় জোহনের। বুকের গভীর তলদেশ থেকে নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস নানা স্তর ঠেলে-ঠেলে উঠে আসে।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন জোহানদের বাজনার দল পেডার রোডের এক বিয়ে বাড়িতে বাজনার বায়না পেল।

সকালে নয়, বিকেলের কিছু আগে তাদের বাজাতে যেতে হবে। বিকেলবেলা 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র সঙ্গে পেডার রোডে এসে অবাক হয়ে গেল জোহন। দারুণ ভিড়

চারদিকে। ডজন-ডজন ইম্পোর্টেড দামি কার এখানে ওখানে পার্ক করা রয়েছে। ভিড়ে এবং গাড়িতে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। চারপাশের স্কাই-স্ক্রেপারগুলোর ব্যালকনি আর জানলায় অগুনতি মুখ দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে কোনওরকমে একেকটা গাড়ি থেকে দু-একজন নাম-করা ফিল্মস্টার নেমেই ছুটে সামনের একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ঢুকে যাচ্ছে। কিছু যুবক-যুবতী হাল্লা করে তাদের পিছুপিছু ছুটছে।

যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ফিল্মস্টাররা ঢুকছে, সবার দৃষ্টি সেদিকেই। বাড়িটা আলো আর ফুলে চমৎকার করে সাজানো। দেখেই বোঝা যায় এটা উৎসবের বাড়ি। জোহনরা এখানেই বাজাতে এসেছে। কার বিয়ে, কে ইফতিকার সাহেবকে বায়না দিয়ে গেছে, কিছুই জানে না জোহন। ভিড়ের ভেতর পথ করে-করে ইফতিকার সাহেবের পিছু পিছু ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো, তারা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার ভেতর ঢুকে পড়ল।

ভেতরে বিরাট ব্যাপার। বিশাল প্যান্ডেলে গেস্টদের অনেকেই এসে গেছে। জোহনরা অবশ্য প্যান্ডেলে ঢুকতে পেল না। একটা লোক এগিয়ে এসে তাদের উলটোদিকে একটা শামিয়ানার নীচে অপেক্ষা করতে বলল। সেখানে আরও চার-পাঁচটা ব্যান্ডপার্টি বসে ছিল। লোকটা বলল, আমি যখন বাজাতে বলব, তখন বাজাবে।

বলেই চলে গেল।

জোহনরা বসেই আছে, বসেই আছে। চারদিকে ভিড়, চিৎকার এবং জ্যাম বেড়েই চলেছে। ইফতিকার সাহেব হঠাৎ বলল, 'বসে-বসে বাত ধরে যাবে দেখছি; উঠে একটু ঘুরে টুরে আসি।' বলে চলে গেল।

দশ মিনিটও কাটল না, উদভ্রান্তের মতো ছুটতে-ছুটতে চলে এল ইফতিকার সাহেব। এসেই জোহনের হাত ধরে এক টানে তুলে ফেলল তাকে। বলল, 'আজ আর তোকে এখানে বাজাতে হবে না; তুই ঝোপড়াপট্টিতে ফিরে যা।'

জোহন অবাক! বলল, বাজাব না কেন?

পরে শুনিস, এখন চলে যা—

জোহন কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল; তার আগেই চারপাশের হই-চই পঞ্চাশ গুণ বেড়ে গেল, অনেক লোক একসঙ্গে সামনের দিকে দৌড়ে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে দেখা গেল ভিড়ের ভেতর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ইমপোর্টেড গাড়ি পথ করে খুব আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। গাড়িটার পিছনের সিটে সেবাস্টিয়ান আর মেরি। তাদের দু-ধারে দুজন নাম-করা চিত্রতারকা। মেরি আর সেবাস্টিয়ান সাহেবের পরনে বিয়ের পোশাক; গলায় ধবধবে জুঁইয়ের মালা। সম্ভবত ওরা চার্চ থেকে আসছে। শরীরের সব রক্তস্রোত যেন মুহুর্তের জন্য থমকে গেল জোহনের। আরব সাগরের কুলে এত পর্যাপ্ত বাতাস, তবু তার মনে হল শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ পাশ থেকে ইফতিকার সাহেব খুব চাপা গলায় বলে উঠল, 'চলে যা জোহন, চলে যা। কার বিয়েতে বাজাতে এসেছি আগে জানলে, কিছুতেই বায়না নিতাম না। যা, এখনই চলে যা।'

জোহন যেতে পারল না, শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এদিকে গাড়িটা প্যান্ডেলের কাছে এসে থামল। সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে নামতে-নামতে হঠাৎ মেরির চোখ এসে পড়ল জোহনের দিকে। কয়েক সেকেন্ড সে যেন নিশ্চল দাঁড়িয়ে গেল, তারপরেই মুখ নামিয়ে সেবাস্টিয়ান সাহেবের পিছুপিছু প্যান্ডেলে গিয়ে ঢুকল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সেই লোকটা দৌড়তে-দৌড়তে এসে দারুণ তাড়া লাগলো, 'বাজাও, বাজনা শুরু করে দাও—'

ইফতিকার সাহেব জোহনকে বারবার চলে যেতে বলেছে; জোহন কিন্তু যায়নি। ব্যান্ডপার্টির বাজনাদারদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে প্রায় উন্মাদের মতো ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে গেল।

ব্যান্ডমাস্টার কাম-মালিক ইফতিকার সাহেব তাকে লক্ষ করতে-করতে ভাবতে লাগল, গাধধে কা পাঠঠের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল কি না।

তারপর সময় কাটতে থাকে। শরীর ভাঙতে থাকে জোহনের। মুখটা রেখায়-রেখায় আরও জটিল হয়ে যায়; পিঠ ধনুকের মতো বাঁকতে থাকে। কিন্তু জীবন পুরোনো নিয়মেই বয়ে যায়। তবে একেকদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ঝোপড়াপট্টির লোকেরা শুনতে পায়, জোহন ক্ল্যারিওনেট সেই গান দুটো বাজাচ্ছে—

'আচানক এক মুসাফির আয়া থা, ও চলে গয়ে' কিংবা 'ও পুরবৈঁয়া মাত্ যা, মাত্ যা—

বিষাদ-মাখানো এই করুণ গান দুটো জোহন মেরিকে প্রথম শিখিয়েছিল। আর এই গানের রেকর্ড করেই রাতারাতি মেরির নাম হয়ে গেছে।

মাঝরাতে জোহনের ক্ল্যারিওনেটের সুর বিশাল বম্বে শহরের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ একসময় বাজনা থামিয়ে জোহন ভাবতে থাকে, সত্যিই কি তার জীবনে কেউ কিছুক্ষণের জন্য এসেছিল! আগাগোড়া সব ব্যাপারটাই তার কাছে একটা ঝাপসা হয়ে-আসা বিষয়ে স্বপ্নের মতো মনে হয়।